মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

এপ্রিল ২০২৬
চৈত্র ১৪৩২ বৈশাখ ১৪৩৩
শাওয়াল-যুলক্বা'দাহ ১৪৪৭
বর্ষ ৪৫
সংখ্যা ০৭

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩
দারসুল কুরআন ॥ ৫
দারসুল হাদীস ॥ ১৫
মতামত
শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'মক্কা' 'ফক্কা' ইউনিভার্সিটি
আবুল আসাদ ॥ ২৩
চিন্তাধারা
ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য
ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী ॥ ২৭
ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্নীতিমুক্ত সমাজব্যবস্থা গঠনে
নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য
ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম ॥ ৩৯
আন্তর্জাতিক
গাজার যুদ্ধ ও বর্তমান পরিস্থিতি
মীযানুল করিম ॥ ৫৩
প্রশ্নোত্তর ॥ ৫৯
বই পরিচিতি ॥ ৬৪

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :
সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

বিভিন্ন দেশে প্রতি কপি পত্রিকা পাঠানোর বার্ষিক ডাক খরচ

দেশের নাম	সাধারণ ডাক খরচ	রেজিঃ ডাক খরচ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

২. টাকা পাঠানোর নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মানি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫ (২০৫০২১৫০২০০১০৮৫১০) এম.এস.এ, ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়।
- ✳ অথবা ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০ নাম্বারে বিকাশ মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যায়।
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

সম্পাদকীয়

রাজনীতিতে ইতিবাচক ধারার শুভ সূচনা হোক

মুসলিম উম্মাহর মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার কল্যাণ। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, "তোমরাই উত্তম জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।" এখানে মানবতার কল্যাণের জন্য দুটি কাজের কথা বলা হয়েছে। একটি হলো যা মানুষের জন্য ভালো ও কল্যাণকর তা প্রবর্তন করা এবং অন্যটি হলো যা মন্দ ও ক্ষতিকর তা বর্জন করা। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা ভালো ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো এবং অপরাধ ও সীমালংঘনমূলক কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।"

একটি হাদিসে মুমিনদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "তারা হলো কল্যাণের দ্বার উন্মুক্তকারী এবং অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধকারী।"

মোট কথা মুমিনদের সমাজ এমন হবে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি ভালো কাজের উৎসাহ দিয়ে তার ব্যাপক প্রচলন করবে এবং মন্দ কাজে বাধা দিয়ে তা বন্ধ করার চেষ্টা করবে। তারা ভাল কাজে পরস্পর সহযোগী হবে এবং মন্দ কাজে হবে অসহযোগিতাকারী। এভাবে ভালো কাজে সহযোগিতা ও মন্দ কাজে অসহযোগিতার ধারা অব্যাহত থাকলে সমাজে ভালো কাজের প্রচলন হবে এবং মন্দ কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। আর এটি হলেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

সমাজের বৃহৎ ইউনিট হল রাষ্ট্র। যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকেন তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "যাদেরকে আমি ভূ-পৃষ্ঠে ক্ষমতা দান করলে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাধা দেয়।"

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুমিনদের সমাজ বা রাষ্ট্রে সাধারণ জনগণ ও শাসকগণ-সকলেই অন্যায়-অকল্যাণ বন্ধ করে মানব কল্যাণমূলক কাজে সদা তৎপর থাকবে এবং এক্ষেত্রে শাসক ও শাসিত সকলেই পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। সৎকাজ প্রচলনে যেমন পরস্পরকে সহযোগিতা করবে তেমনি অসৎ কাজ বন্ধেও পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। এখান থেকে একটি রাষ্ট্রের সরকার, বিরোধীদল এবং সর্বসাধারণের ভূমিকা কি হবে তা জানা যায়। সরকার যদি ভালো কাজ করে তাহলে বিরোধীদল ও সর্বসাধারণের দায়িত্ব হল তার সহযোগিতা করা এবং সরকার যদি অন্যায় করে, তাহলে বিরোধীদল ও সর্বসাধারণের দায়িত্ব হল তাতে বাধা দেওয়া। অপরদিকে বিরোধীদল বা জনসাধারণ বা তাদের কেউ যদি ভালো কাজ করে, তাহলে সরকারের দায়িত্ব হল তাতে সার্বিক সহযোগিতা করা। পক্ষান্তরে বিরোধী দল বা জনসাধারণের কেউ যদি অন্যায় করে তাহলে সরকারের দায়িত্ব হল তা থেকে

তাদেরকে বিরত রাখা। কোন রাষ্ট্র যদি এ মূলনীতির আলোকে পরিচালিত হয়, তাহলে সে রাষ্ট্র হবে জনবান্ধব, জনকল্যাণকর একটি মানবিক রাষ্ট্র।

কিন্তু বাংলাদেশে শুরু থেকেই এই মূলনীতির অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। এখানকার সরকার অন্যায় নিবারণের পরিবর্তে নিজেরাই অন্যায় দুর্নীতিতে নিমজ্জিত থেকেছে। সরকারি ও বিরোধী দল একে অপরের সহযোগিতার পরিবর্তে দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত থেকেছে। সরকারি দল বিরোধীদল দমনে ব্যস্ত থেকেছে আর বিরোধীদল সরকার উৎখাতের আন্দোলনে রত থেকেছে। এতে দেশের উন্নয়ন যেমন ব্যাহত হয়েছে, তেমনি জনকল্যাণ ও শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছে।

গত ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর রাজনীতিতে কিছুটা ইতিবাচক ধারা সূচিত হওয়ার আলামত দেখা যাচ্ছে। এবারের নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠন করেছে এবং প্রথমবারের মতো প্রধান বিরোধী দল হয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও তার জোট। জামায়াতে ইসলামী একটি অত্যন্ত সুসংগটিত ও সুশৃংখল দল। এ দলের আমীর ডা. শফিকুর রহমান একজন দেশদরদী প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ। পাশাপাশি তিনি একজন সামাজিক ও মানবিক নেতা। অপরদিকে বিএনপি প্রধান জনাব তারেক রহমান এবারই প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তারও রয়েছে বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক উত্তরাধিকার। কারণ তিনি স্বাধীনতার ঘোষক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সন্তান। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেই জামায়াতে ইসলামী সহ বিরোধীদলগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। তার সে আহবানে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। সম্প্রতি জামায়াতে ইসলামীর ইফতার মাহফিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই মাহফিলে বক্তব্য রেখেছেন।

সেখানেও সরকার প্রধান এবং বিরোধী নেতা পরস্পরের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। এতে জনগণের মধ্যে ইতিবাচক রাজনীতির সূচনার আশা জাগ্রত হয়েছে।

আমরা আশা করব, দেশের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণের স্বার্থে মিলেমিশে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সরকার ও বিরোধী দল দেশ পরিচালনা করবেন। দ্বন্দ্ব সংঘাতের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে সমঝোতার রাজনীতির ইতিবাচক ধারা চালু করবেন। এটাই সরকার ও বিরোধী দলের প্রতি জনগণের প্রত্যাশা। ■

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم .

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم .

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِه وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

ভাবানুবাদ

হিকমাত ('বিজ্ঞতা-বুদ্ধিমত্তা-বিচক্ষণতা) অবলম্বন করে ও নছীহাতপূর্ণ সুন্দর বক্তব্যের মাধ্যমে লোকদেরকে তোমার রবের পথের দিকে ডাক। আর তাদের সাথে বাক্য বিনিময় কর সর্বোত্তম যুক্তি-প্রদর্শন করে। অবশ্যই তোমার রব বেশি জানেন কে তাঁর পথচ্যুত হয়েছে এবং তিনি বেশি জানেন কে আছে সঠিক পথে।' (সূরা আন্ নাহল : ১২৫)

পরিপ্রেক্ষিত

ঈসায়ী ৬১০ সনে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়াত দান করেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম তিনটি বছর নিরবে দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। অতপর সরবে দা'ওয়াত দেওয়ার নির্দেশ আসার পর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আছ্ ছাফা পাহাড়ে ওঠে "ইয়া সাবাহাহ" "ইয়া সাবাহাহ" ধ্বনি দেন। তাৎক্ষণিকভাবে লোকদেরকে একত্রিত করে কোন বিপদের সংবাদ দেওয়ার জন্য কোন উঁচু স্থানে ওঠে এই ধ্বনি দেওয়া ছিলো তখনকার আরবদের একটি নিয়ম।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কণ্ঠে উক্ত ধ্বনি উচ্চারিত হলে লোকেরা ছুটে এসে আছ্ ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হয়।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমবেত জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যদি বলি তোমাদের ওপর হামলা চালাবার জন্য একদল অশ্বারোহী সৈন্য আবু কুবাইস পাহাড়ের ওদিকে অপেক্ষমান, তোমরা কি বিশ্বাস করবে?' লোকেরা বললো,

'অবশ্যই করবো। কারণ তুমি তো কখনো মিথ্যা কথা বল না।' তখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আখিরাতের মহা বিপদ এবং তা থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন।

পৌত্তলিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত আবু লাহাব ভীষণ ক্ষেপে যায়। সে একখণ্ড পাথর নিজের হাতে তুলে নিয়ে তার ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং বলে ওঠে, 'তোমার সর্বনাশ হোক। এই জন্য তুমি আমাদেরকে ডেকে এনেছো?' অতপর সে লোকদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়।

তখন থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সরবে দীনের দা'ওয়াত দিতে থাকেন।

মুশরিকরা হাসি-তামাশা, গাল-মন্দ, হুমকি-ধমকি এবং বানোয়াট কথা প্রচার করে তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। মুশরিকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সত্য-সন্ধানী যুবক-যুবতীরা একে একে মুমিনদের কাফিলায় শামিল হতে থাকে। এতে মারমুখো হয়ে ওঠে মুশরিক শক্তি। নবুওয়াতের পঞ্চম সন থেকে দৈহিক নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে অবস্থা এতোই নাজুক হয়ে ওঠে যে বহু সংখ্যক মুমিন ঘর-দোর, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভেড়া-ঘোড়া-উট ইত্যাদি পেছনে ফেলে হাবশায় হিজরাত করেন।

আর যাঁরা মাককায় থেকে গিয়েছিলেন তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ সনে কুরাইশদের দশটি গোত্রের নয়টি গোত্র বানু হাশিমের বিরুদ্ধে একটি বয়কট চুক্তি স্বাক্ষরিত করে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হত্যা করার জন্য তাদের হাতে না দেওয়া পর্যন্ত এই বয়কট চুক্তি বলবৎ থাকবে বলে স্থিরীকৃত হয়। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য আবু তালিবের নেতৃত্বে বানু হাশিম এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহ মুমিনগণ তাঁবু খাটিয়ে শিয়াবে আবু তালিব নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকেন।

তিনটি বছর পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। অবশেষে আল্লাহর অনুগ্রহে কয়েকজন বিবেকবান কুরাইশ যুবকের উদ্যোগে এই অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), মুমিনগণ এবং বানু হাশিম মুক্তি লাভ করেন। তবে বিরোধিতার মাত্রা সমভাবেই চলতে থাকে। মুমিনদের জন্য মাককায় জীবন যাপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এই সময়টিতে নাযিলকৃত সূরাগুলোর একটি হচ্ছে সূরা আন্ নাহল। অর্থাৎ সূরা আন্ নাহল মাককী জীবনের শেষ ভাগের কোন এক সময় নাযিল হয়।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন একত্ববাদের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন শিরকের অসারতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অত্যন্ত নগণ্য একটি ফোঁটা থেকে যে মানুষের সৃষ্টি তা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহর প্রেরিত বিধান নিয়ে বিতর্ক না করতে বলেছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানুষের জন্য সৃষ্ট বহু সংখ্যক নি'মাতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং অসংখ্য বিভ্রান্ত পথে না চলে মানুষের কর্তব্য যে কাছদুস্ সাবীল অর্থাৎ সোজা-সঠিক পথে চলা তা পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহর প্রেরিত রাসূলের অবাধ্যতা করার ভয়াবহ পরিণতির কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি অবতীর্ণ বিধান মানুষের জীবনে যেইসব নৈতিক পরিবর্তন আনতে চায় সেইগুলো সংক্ষেপে, অথচ হৃদয়গ্রাহীভাবে বর্ণনা করেছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যারা নিজেরা কুফর অবলম্বন করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তাদেরকে আযাবের পর আযাব দেবেন বলে জানিয়েছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কাফিরদের পরিচালিত যুলম-নির্যাতনের মুকাবিলায় মুমিনদের অনুসৃতব্য নীতি-সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহর পথে লোকদেরকে আহ্বান জানানোর বাস্তব সম্মত পদ্ধতি মুমিনদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা

আলকুরআনের বিভিন্ন স্থানে আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ-র তাকিদ সম্বলিত আয়াত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সূরা আল মুদ্দাস্সির-এর ২য় ও ৩য় আয়াতে এই সম্পর্কে প্রথম নির্দেশ এসেছে। আয়াত দুইটিতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্বোধন করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

قُمْ فَأَنْذِرْ ০ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ০

'ওঠ, লোকদেরকে সাবধান কর। তোমার রবের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর, প্রতিষ্ঠা কর।'

সূরা আশ্ শূরা-এর ১৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

فَلِذَلِكَ فَادْعُ صلى وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ صلى وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ صلى

'এমতাবস্থায় তুমি দা'ওয়াত দিতে থাক। আর দৃঢ় থাক যেমনটি তোমাকে আদেশ করা হয়েছে। ঐসব লোকের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করো না।'

সূরা ইউসুফ-এর ১০৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

قُلْ هذِه سَبِيْلِىْ اَدْعُوْا اِلَى اللهِ ০

'ওদেরকে বল, এটাই তো আমার পথ যে আমি লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই।'

সূরা আল মা-য়িদাহ-এর ৬৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ صلى وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه ج

'হে রাসূল, তোমার রবের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা লোকদের নিকট পৌঁছাও। তুমি যদি তা না কর, তাহলে তো রিসালাতের দায়িত্বই পালন করলে না।'

সূরা আল কাসাস-এর ৮৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ○

'তোমার রবের দিকে লোকদেরকে ডাক।'

যেই কথাগুলো ব্যবহার করে লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানো হয় সেই কথাগুলো সর্বোত্তম কথা বলে উল্লেখ করে সূরা হামীমুস সাজদাহ-র ৩৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اَنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

'সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহর দিকে লোকদেরকে ডাকে, আমালুছ্ ছালিহ করে এবং বলে : নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের একজন।'

ছালাত, ছাওম ও যাকাতের মতো নবী-রাসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) আরেকটি অভিন্ন কাজ ছিলো আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহর কাজ।

কুর্দিস্তানে প্রেরিত হয়েছিলেন নূহ (আলাইহিস সালাম)। তিনি তাঁর কাউমকে সম্বোধন করে বলেন,

اِنَّنِىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۙ اَنْ لاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اللهَ ؕ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ○

'আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট সাবধানকারী হিসেবে এসেছি। তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না। অন্যথায় আমি আশংকা করছি তোমাদের ওপর একদিন কষ্টদায়ক আযাব এসে পড়বে।'

প্রাচীন ইরাকের উর সাম্রাজ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)। তিনি তাঁর কাউমকে সম্বোধন করে বলেন,

اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ صلى ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

[সূরা আল 'আনকাবূত ॥ ১৬]

'তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁকে ভয় করে চল। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা তা বুঝ।'

প্রাচীন আরবের প্রতাপশালী আদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন হূদ (আলাইহিস সালাম)। তিনি তাঁর কাউমকে সম্বোধন করে বলেন,

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ○

[সূরা হূদ ॥ ৫০]

'হে আমার কাউম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।'

প্রাচীন আরবের আরেক প্রতাপশালী জাতি ছিলো সামুদ জাতি। এরা পাথরের পাহাড় খোদাই করে প্রাসাদ বানিয়ে তাতে বসবাস করতো।

সামুদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন ছালিহ (আলাইহিস সালাম)। তিনি তাঁর কাউমকে সম্বোধন করে বলেন,

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ○

[সূরা হূদ ॥ ৬১]

'হে আমার কাউম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।'

প্রাচীন আরবের তাবুক এবং এর নিকটবর্তী বিস্তৃত এলাকায় বসবাস করতো মাদ্ইয়ান জাতি। এদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন শুয়াইব (আলাইহিস সালাম)। তিনি তাঁর কাউমকে সম্বোধন করে বলেন,

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ○

[সূরা হূদ ॥ ৮৪]

'হে আমার কাউম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।'

কানান বা ফিলিস্তিনে বসবাসকারী ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর এক নেক সন্তান ছিলেন ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)। ঈর্ষাপরায়ণ ভাইদের চক্রান্তের শিকার হয়ে তিনি বিজন মরুভূমির এক কূয়াতে নিক্ষিপ্ত হন। একটি বাণিজ্য কাফিলার লোক তাঁকে কূয়া থেকে বের করে মিসরে নিয়ে সেখানকার প্রতাপশালী এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে। সেই প্রতাপশালী ব্যক্তির স্ত্রীর যৌনক্ষুধা মেটাবার জন্য আহূত হয়েও তিনি তাতে সাড়া না দেওয়ায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

ইতোমধ্যে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) নবুওয়াত লাভ করেন। কারাগারের বন্দীদের মাঝেই তিনি দা'ওয়াতী কাজ শুরু করেন। বন্দীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন,

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۚ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

[সূরা ইউসুফ ॥ ৪০]

'সার্বভৌমত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়। তাঁর নির্দেশ ঃ তাঁকে ছাড়া তোমরা আর কারো ইবাদাত করবে না। এটাই মজবুত জীবন ব্যবস্থা। অথচ অধিকাংশ লোকই তা জানে না।'

প্রাচীন মিসরের ফিরআউন মারনেপতাহ-এর নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন মূসা ইবনু ইমরান (আলাইহিস সালাম)। তিনি মিসরবাসীর নিকট এবং ফিরআউনের নিকট দীনের দা'ওয়াত দিতে থাকেন।

ফিরআউনের সামনে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন,

أَنْ أَدُّوآ إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ صلى إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○ وَأَنْ لاَّ تَعْلُوا عَلى اللهِ صلى إِنِّي آتِيْكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ○

[সূরা আদ্ দুখান ॥ ১৮, ১৯]

'আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার হাতে সঁপে দাও। আমি তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত রাসূল হিসেবে প্রেরিত। আল্লাহর ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে যেয়ো না। আমি তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট সনদ পেশ করছি।'

ফিলিস্তিনে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)। তিনি তাঁর কাউমকে সম্বোধন করে বলেন,

وَاِنَّ اللهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ج هذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

[সূরা মারইয়াম ॥ ৩৬]

'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব, তোমাদেরও রব। অতএব একমাত্র তাঁরই ইবাদাত কর। এটাই সরল-সঠিক পথ।'

দা'ওয়াতী কাজের মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণ সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

مَنْ دَلَّ عَلى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ ○

[আবু মাস'উদ উকবা ইবনু আমর আল আনছারী (রা), ছাহীহ মুসলিম]

'যেই ব্যক্তি কোন ভালো পথ দেখায়, সেই ব্যক্তি এতোটাই বিনিময় পায় যতোটা ঐ কাজ সম্পাদনকারী পেয়ে থাকে।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

مَنْ دَعَا اِلى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ ○

[আবু হুরাইরা (রা), ছাহীহ মুসলিম]

'যেই ব্যক্তি কাউকে হিদায়াতের পথের দিকে ডাকে, তার জন্য ঐ পথের অনুসারী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত পুরস্কারের অনুরূপ পুরস্কার রয়েছে।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলী ইবনু আবী তালিবকে (রা) বলেন,

فَوَاللهِ لَاَنْ يَّهْدِىَ اللهُ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ ○

[সাহল ইবনু সা'দ আস্ সায়েদী (রা), ছাহীহ মুসলিম]

'আল্লাহর শপথ, তোমার দ্বারা আল্লাহ যদি একজন ব্যক্তিকে হিদায়াতের পথে আনেন, তা তোমার জন্য লাল উট লাভ করার চেয়েও উত্তম।'

দা'য়ী ইলাল্লাহকে ত্বরা-প্রবণতা পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সমাজে পরিবর্তন আনার আগে মানুষের চরিত্রে বা কর্মধারায় পরিবর্তন আনতে হবে এবং চরিত্রে পরিবর্তন আনার আগে মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। আর এই পরিবর্তন আনয়ন সময়

সাপেক্ষ ব্যাপার। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ওপর তাওয়াক্কুল করে পরম ধৈর্যসহকারে এই কাজ একনিষ্ঠভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

একজন দা'য়ী ইলাল্লাহ পূর্ণাংগ ইসলামকেই মানুষের সামনে তুলে ধরবেন। কারো ভয়ে কিংবা 'হিকমাতের' ভুল ব্যাখ্যা করে ইসলামের অংশ বিশেষ তুলে ধরা এবং অংশ বিশেষ গোপন করা অন্যায়।

এই সম্পর্কে সূরা আলবাকারা-র ১৪০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَه مِنَ اللهِ ○

'ঐ ব্যক্তির চেয়ে কে বেশি যালিম হতে পারে যার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া একটি সাক্ষ্য রয়েছে, আর সেটি সে গোপন করে?'

সূরা আলবাকারা-র ১৫৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ ۙ اُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ○

'যারা আমার নাযিলকৃত স্পষ্ট শিক্ষা ও হিদায়াত গোপন করে অথচ তা আমি সকল মানুষকে পথ দেখাবার জন্য আমার কিতাবে বর্ণনা করেছি, আল্লাহ তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেন এবং লা'নতকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।'

পূর্ণাংগ ইসলামকে মানুষের সামনে তুলে ধরার তাকিদ দিয়ে সূরা হূদ-এর ১২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ ۢ بَعْضَ مَا يُوْحى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ ۢ بِه صَدْرُكَ أَن يَّقُولُواْ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَآ أَنْتَ نَذِيْرٌ ۚ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ○

'এমন যেন না হয় যে তোমার প্রতি যা কিছু ওহী করা হচ্ছে তার কিছু অংশ তুমি উপস্থাপন করা থেকে বাদ দেবে এবং এই সব প্রচারণায় তোমার মন সংকুচিত হবে যে এই ব্যক্তির ওপর কোন ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়নি কেন অথবা এর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন? তুমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। আর সব কাজের বিধায়ক তো আল্লাহই।'

আলোচ্য আয়াতে (অর্থাৎ সূরা আন নাহল-এর ১২৫ নাম্বার আয়াতে) আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় দা'ওয়াত দানের পদ্ধতি তুলে ধরেছেন। তিনি দা'য়ী ইলাল্লাহকে (১) হিকমাত অবলম্বন, (২) নছীহাতপূর্ণ সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন এবং (৩) সর্বোত্তম যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে দা'ওয়াত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

(১) হিকমাত অবলম্বন।

আলহিকমাত শব্দটির বহুবিধ অর্থ রয়েছে। এখানে শব্দটি বিজ্ঞতা-বুদ্ধিমত্তা-বিচক্ষণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ যেন তেন ভাবে করার কাজ নয়। এটি বিজ্ঞতা-বুদ্ধিমত্তা-বিচক্ষণতা

দাবি করে।

দা'য়ী ইলাল্লাহকে পরিবেশ-পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ব্যক্তি মানসিকভাবে কী অবস্থায় আছেন তা আঁচ করতে হবে।

ব্যক্তির সময়ের অবস্থা কী তাও জানতে হবে।

আলাপ-আলোচনাকালে নিজে কিছু বলতে হবে, তাঁকেও বলতে দিতে হবে।

আলাপচারিতার ভেতর দিয়েই ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে।

যেই বিষয়ে তাঁর চিন্তায় বিভ্রান্তি রয়েছে, সেই বিষয়ে আলকুরআন ও আলহাদীসের বক্তব্য তাঁর সামনে তুলে ধরতে হবে।

আলাাপ-আলোচনায় ভদ্রতা-শালীনতা বজায় রাখতে হবে।

কোন অবস্থাতেই রেগে যাওয়া যাবে না।

বক্তব্য শুনে শ্রোতার মনে যেন এই ধারণা সৃষ্টি না হয় যে ভদ্রলোক আমাকে গবেট মনে করছেন।

বক্তব্য শুনে শ্রোতার মনে যেন এই ধারণা সৃষ্টি না হয় যে ভদ্রলোক আমাকে অবজ্ঞা করছেন।

হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা শুরু হওয়া প্রয়োজন এবং হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশেই তা শেষ হওয়া প্রয়োজন।

(২) নছীহাতপূর্ণ সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন।

বক্তব্য হতে হবে সঠিক।

বক্তব্য হতে হবে সোজা-সুস্পষ্ট, কোন ধোঁয়াশা ভাব থাকবে না। এতে কোন গোঁজামিল থাকবে না।

বক্তব্যের ভাষা হতে হবে প্রাঞ্জল।

বক্তব্য হতে হবে হৃদয়গ্রাহী।

বক্তব্য হতে হবে এমন যা একদিকে শ্রোতার আবেগ, অন্য দিকে শ্রোতার বুদ্ধিবৃত্তিকে নাড়া দেবে।

বক্তব্য এমন হওয়া চাই যা শ্রোতার মনে এমন আলোচনা আরো শুনার আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

(৩) সর্বোত্তম যুক্তি প্রদর্শন

সুন্দর সুন্দর উদাহরণ ও যুক্তি উপস্থাপন করে বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।

আলোচনাকে বিতর্ক অনুষ্ঠানে পরিণত করা যাবে না।

বুদ্ধির লড়াইতে অন্যকে হারিয়ে দেওয়া লক্ষ্য হবে না।

গলাবাজি করা যাবে না।

যুক্তি প্রদর্শনকালে মধুর বাক্য ব্যবহার করতে হবে।

কূট-তর্কে জড়িয়ে পড়া যাবে না।

আলোচনা উত্তেজনার দিকে এগিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে আলোচনার ইতি টানতে হবে। হাসিমাখা মুখে হাত মিলিয়ে শান্তভাবে বিদায় গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে কোন লোকের হিদায়াত প্রাপ্তি সম্পর্কে আরেকটি মহাসত্য ব্যক্ত করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِه وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

'অবশ্যই তোমার রব ভালো করেই জানেন কে তাঁর পথচ্যুত এবং তিনি ভালো করেই জানেন কারা সঠিক পথের পথিক।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চাচা আবু তালিবকে মুসলিম বানাবার জন্য বারবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আলকাসাস-এর ৫৬ নাম্বার আয়াত নাযিল করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّكَ لاَتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ج وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

'তুমি যাকে চাও তাকেই হিদায়াত করতে পার না। আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন। আর তিনি ভালো করেই জানেন কারা হিদায়াতের পথের পথিক।'

হিদায়াত প্রাপ্তি সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আলকুরআনে বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন। এইসব বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে, যেই ব্যক্তি আল্লাহর দিকে এগিয়ে আসতে চায় আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে টেনে নেন। কিন্তু যেই ব্যক্তি তাঁর দিকে আসতেই চায় না, তার পেছনে দৌড়ানো আল্লাহর কাজ নয়।

অর্থাৎ হিদায়াত প্রাপ্তি একদিকে ব্যক্তির আগ্রহ, অন্যদিকে আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল।

শিক্ষা

১. বিজ্ঞতা-বুদ্ধিমত্তা-বিচক্ষণতাসহকারে, নছীহাতপূর্ণ সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং সর্বোত্তম যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে লোকদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানাতে হবে।

২. হিদায়াত প্রাপ্তি একদিকে ব্যক্তির আগ্রহ, অন্যদিকে আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। দা'য়ী ইলাল্লাহ চাইলেই কাউকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসতে পারবেন না। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক অব্যাহতভাবে দা'ওয়াতী কাজে আত্মনিবেদিত থাকা।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ

১৪ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ»؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ: اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ:

"আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কে এ কথাগুলো আমার নিকট থেকে গ্রহণ করে সেগুলোর প্রতি 'আমল করবে অথবা সে ব্যক্তিকে শিক্ষা দেবে যে সেগুলোর প্রতি 'আমল করবে? আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা), আমি। তখন তিনি আমার হাত ধরে পাঁচটি গণনা করলেন এবং বললেন : হারামকে বর্জন করো তাহলে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী 'ইবাদাতকারী হবে। আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকো তাহলে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হবে। তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করো তাহলে মুমিন হবে। মানুষের জন্য তাই পছন্দ করো, যা তোমার নিজের জন্য পছন্দ করো তাহলে মুসলিম হবে। আর অধিক হেসো না, কেননা অধিক হাসি অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেয়।"[১]

হারাম বর্জন করা : নিষিদ্ধ বা হারাম কাজের দিকে মানুষ সহজেই ঝুকে পরে। কারণ কুপ্রবৃত্তি মানুষকে নিষিদ্ধ কাজের দিকে প্ররোচিত করে এবং শয়তান মানুষকে সেদিকে চালিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। নফ্স বা প্রবৃত্তির চাহিদাকে অত্যন্ত সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

"নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনারোপা, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু এবং ফসল ইত্যাদি প্রবৃত্তির পছন্দনীয় বিষয়কে মানুষের জন্য সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। এগুলো পার্থিব জীবনের সামান্য ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁর নিকটেই রয়েছে উত্তম

১. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৩০৫

আশ্রয়স্থল।"[২] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

"আর আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করিনা। নিশ্চয় নফ্স বা প্রবৃত্তি মন্দ কাজের অধিক প্ররোচনা দানকারী।"[৩]

এভাবেই কুপ্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে মন্দ ও হারাম কাজে লিপ্ত করে। তখন মানুষ আল্লাহর আদেশ নিষেধ ভুলে গিয়ে, 'ইবাদাত বন্দেগী ছেড়ে বিপথে পরিচালিত হয় এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয়। এ জন্য হারাম কাজকে পরিহার করার জন্য সবিশেষ তাকিদ দেওয়া হয়েছে এবং তার ধারে কাছেও যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ "

"'আমির (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবন বাশীর (রা.)এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এর মাঝে রয়েছে সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ, যেগুলো সম্পর্কে অনেক মানুষ অবগত নয়। যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলো পরিহার করে সে ব্যক্তি তার দ্বীন ও সম্ভ্রমকে সংরক্ষণ করে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহে লিপ্ত হবে, সে ঐ রাখালের ন্যায় যে নিষিদ্ধ সীমানার চারপার্শ্বে পশু চরায়, যার আশংকা রয়েছে অচিরেই তাতে ঢুকে পরার। জেনে রেখ! প্রত্যেক বাদশার-ই একটি নিষিদ্ধ সীমানা থাকে। জেনে রেখ! এ পৃথিবীতে আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমারেখা হলো তার হারামসমূহ। জেনে রেখ! নিশ্চয় মানুষের শরীরে একটি মাংশপিণ্ড রয়েছে। সেটি ঠিক থাকলে পুরো শরীর ঠিক থাকে। আর সেটি খারাপ হলে পুরো শরীর-ই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রেখ! সেটি হলো অন্তর।[৪]

أَنَّ ابْنَ مُنَبِّهٍ، كَانَ يَقُولُ: «أَعْوَنُ الْأَخْلَاقِ عَلَى الدِّينِ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا، وَأَوْشَكُهَا رَدًى اتِّبَاعُ الْهَوَى، وَمِنَ اتِّبَاعِ الْهَوَى الرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا، وَمِنَ الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ، وَمِنْ

২. ৩, সূরা আলে 'ইমরান : ১৪)
৩. ১২,সূরা ইউসুফ : ৫৩)
৪. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাবু ফাজলি মান ইস্তাব্রাআ লি-দ্বীনিহি, হাদীছ নং ৫২)

حُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ اسْتِحْلَالُ الْمَحَارِمِ، وَمِنَ اسْتِحْلَالِ الْمَحَارِمِ يَغْضَبُ اللَّهُ،

ইবন মুনাব্বাহ বলতেন, দ্বীনের জন্য সবচেয়ে সহায়ক স্বভাব হলো দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হওয়া। আর সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। প্রবৃত্তির তাবেদারীর অন্যতম হলো দুনিয়ার প্রতি আসক্তি। আর দুনিয়ার প্রতি আসক্তির অন্যতম হলো সম্পদ ও সন্মানের প্রতি আসক্তি। সম্পদ ও সন্মানের প্রতি আশক্তির অন্যতম কারণ হলো হারামকে হালাল মনে করা। আর হারামকে হালাল মনে করার কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।[৫]

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদাত করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা, অন্য কারো নামে নযর মান্নত করা বা অন্য কারো নামে যবেহ করা, মৃত ব্যক্তি বা কবরবাসীর নিকট কোনো কিছু চাওয়া বা প্রার্থনা করা, ইত্যাদি সম্পূর্ণ হারাম। এগুলো থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতে হবে।

খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেগুলো পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। কতিপয় নারীকে মাহরাম ঘোষণার করে তাদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যিনা ব্যভিচার, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুদ, ঘুষ, জুয়া, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা, কারো অধিকার হরণ করা প্রভৃতিও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এগুলোকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতে হবে। যারা হারামগুলোকে হারাম মেনে বর্জন করে না তাদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"আহলি কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তা হারাম গণ্য করে না আর সত্য দ্বীনকে মেনে নেয় না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা বশ্যতা স্বীকার করে নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করে।"[৬]

হারামে লিপ্ত থেকে আল্লাহর অনুগত ও 'ইবাদাতগুজার বান্দা হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহর অনুগত বা 'ইবাদাতগুজার বান্দা হতে হলে হারামসমূহ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। কারণ হারামের সাথে জড়িতদের 'ইবাদাত আল্লাহ গ্রহণ করেন না। এ প্রসঙ্গে হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: ٥١] وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ

---

৫. মুসান্নাফ আবি শাইবা নং ৩৫১৬৮)

৬. ৯, সূরা আত্ তাওবা : ২৯)

طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ "

"আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে লোক সকল, নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র এবং পবিত্র ছাড়া তিনি অন্য কিছু গ্রহণ করেননা। আর আল্লাহ মুমিনদেরকে সে নির্দেশই দিয়েছেন, যে নির্দিশ তিনি রাসূলগণকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার করো এবং ভাল 'আমল করো, নিশ্চয় তোমরা যা করো আমি সে সম্পর্কে অবগত।[৭] এবং তিনি বলেছেন, হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি, তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার করো।[৮] অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ সফর করে এলামেলো চুল আর ধূলিমলিন চেহারা নিয়ে আকাশের দিকে স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারিত করে হে রব, হে রব বলে প্রার্থনা করে থাকে। অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম এবং তার দেহ গঠিত হয়েছে হারামের দ্বারা। তাহলে কিভাবে তার দু'আ কবুল করা হবে?[৯] সুতরাং দুর্নীতিবাজ, ঘোষখোর, জাতীয় অর্থ আত্মসাৎকারী, ব্যাংক লোটপাটকারী, এবং অন্য যে কোনো হারামের সাথে জড়িতদেরকে সতর্ক হতে হবে। কারণ হারাম বর্জন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরও 'ইবাদাৎ কবুল করবেন না। আলোচ্য হাদীছে এ কথাই বুঝানো হয়েছে।

তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা : আল্লাহ যার জন্য যা বন্টন ও বরাদ্দ করেছেন, সে তাই পাবে। এ জন্য বরাদ্দকৃত অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। শত চেষ্টা করলেও তকদীরে যা আছে তার বেশী পাওয়া যাবে না। এ জন্য আল্লাহ যা দিয়েছেন সেটিকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাহলে তার আর আকাঙ্ক্ষা থাকবে না এবং অধিক পাওয়ার পেরেশানী বা না পাওয়ার আফসোস থাকবে না।

প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে চরম পেরেশানীতে লিপ্ত করে এবং দ্বীন থেকে বিমুখ করে। এ ধরনের ব্যক্তি সর্বদা শুধু অর্থ-সম্পদের পিছে ছুটে বেড়ায়। রাশি রাশি সম্পদ লাভ হওয়া সত্বেও তার সম্পদের প্রতি লোভ দূর হয়না। তার সম্পদ যত বাড়ে অভাবও তত বাড়ে। কখনই তার প্রয়োজন শেষ হয়না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)

---

৭. আল মুমিনুন : ৫১)
৮. আল বাকারা : ১৭২)
৯. মুসলিম, কিতাবুয্ যাকাত, বাবু কুবুলিস্ সাদাকাতি মিন কাসাবিত্ তায়্যিবি ওয়া তারবিয়াতিহা, হাদীছ নং ১০১৫)

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে। সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে। তোমরা তা দেখবে। আবার বলছি, নিশ্চয় তা নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষভাবে দেখবে। অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নি'য়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।"[১০]

এ ধরনের দুনিয়া পুজারী লোকেরা আখিরাতে চরম শাস্তির সম্মুখীন হবে।

কিন্তু মুমিনের চরিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা সম্পদ লাভের পিছনে পেরেশান থাকেনা। বরং দ্বীনের কাজে ব্যস্ত থাকে। ফলে তারা স্বল্প সম্পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। তারা দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতের সফলতার জন্য কাজ করে। জীবন ধারনের জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী লাভের জন্য সময় নষ্ট না করে দ্বীনের কাজে পেরেশান থাকে। হাদীছে এটিকেই প্রকৃত ঐশ্বর্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ»

আবু হুরাইরা (রা.) সূত্রে নাবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সম্পদের প্রাচুর্যতা প্রকৃত ঐশ্বর্য নয়, বরং অন্তরের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য।"[১১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَرُزِقَ الْكَفَافَ، وَقَنَعَ بِهِ»

"'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস সূত্রে নাবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে ব্যক্তি সফল হয়েছে, যাকে ইসলামের পথ দেখানো হয়েছে এবং শুধু প্রয়োজন পরিমাণ জীবিকা দেওয়া হয়েছে এবং তাতেই সে সন্তুষ্ট।"[১২]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالْقَنَاعَةِ، فَإِنَّ الْقَنَاعَةَ مَالٌ لَا يَنْفَدُ»

"জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা অল্প সম্পদে তুষ্ট থাকো, কেননা অল্পেতুষ্টি এমন সম্পদ, যা শেষ হয়না।[১৩] সুতরাং আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং এর মধ্যেই প্রশান্তি নিহিত রয়েছে।

---

১০. ১০২, সূরা আত্ তাকাছুর :১-৮)
১১. বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক, বাবু আল গিনা গিনান নাফ্স, হাদীছ নং ৬৪৪৬)
১২. ইবন মাজাহ, কিতাবুয্ যুহ্দ, বাবুল কানা'আতি, হাদীছ নং ৪১৩৮)
১৩. (আল মু'জামুল আওসাত, হাদীছ নং ৬৯২২)

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ

প্রতিবেশীর সাধে সুসম্পর্ক ও সুন্দর আচরণের জন্য ইসলাম জোর তাকিদ দিয়েছে। প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে এতো বেশী তাকিদ দেওয়া হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আশংকা করতেন যে প্রতিবেশীকেও বোধ হয় উত্তরাধিকার দেওয়া হবে। এ বিষয়ে মাসিক পৃথিবী ফেব্রুয়ারী- ২০১৯ সংখ্যায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দকে তা দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিজের পছন্দের মতই অন্যের পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া

এ হাদীছে মুমিন হওয়ার জন্য নিজের যা পছন্দ তা অন্যের জন্যও পছন্দ করতে বলা হয়েছে। নিজের জন্য ভাল জিনিষ আর অন্যের জন্য মন্দ জিনিস পছন্দ করা মুমিনের কাজ নয়। কেননা মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ "নিশ্চয় মুমিনগণ ভাই ভাই।"[১৪]

হাদীছে মুমিনদেরকে এক দেহের বিভিন্ন অংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

"আন নু'মান ইবন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, স্নেহপরায়ণতা ও মায়া-মমতার দিক থেকে মুমিনগণ এক দেহের ন্যায়। এর কোনো অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে সেজন্য গোটা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে ভোগে।"[১৫]

অন্য এক হাদীছে রয়েছে,

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»

"আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য 'ইমারততুল্য, যার এক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে।"[১৬]

অন্য আরেক হাদীছে বলা হয়েছে,

أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَظْلِمُهُ لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ، لَا يَخْطُبِ امْرَؤٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، التَّقْوَى هٰهُنَا، وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ "

---

১৪. ৪৯, সূরা আল হুজুরাত :১০)

১৫. মুসলিম, কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, বাবু তারাহুমিল মুমিনীনা ওয়া তা'আতুফিহিম, হাদীছ নং ২৫৮৬)

১৬. প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ২৫৮৫)

"আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এক মুমিন অন্য মুমিনের ভাই, সে তাকে অপদস্ত করবে না এবং তার প্রতি জুলুমও করবে না। তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের পিছে লেগে থেকো না, পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করোনা। বরং আল্লাহর বন্দাগণ ভাই ভাই হয়ে যাও। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সম্পদ সম্মান ও শোনিত হারাম বা সম্মানার্হ। কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের বিয়ের উপর বিয়ের প্রস্তাব দেবে না এবং তার ভাইয়ের ক্রয়বিক্রয়ের উপর দরদাম করবে না। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের শরীর ও আকৃতির দিকে লক্ষ্য করেন না, বরং তিনি লক্ষ করেন তোমাদের অন্তরের দিকে। তাকওয়া এখানে এবং একথা বলে তিনি তাঁর বক্ষের দিকে ইশারা করলেন।[১৭]

সুতরাং এক মুমিন সর্বদা অন্য মুমিনের কল্যণ কামনা করবে এবং সাধ্যমত তার উপকার করার চেষ্টা করবে। তার সুখে-দুঃখে অংশ গ্রহণ করবে ও সাহায্য করবে। কখনই তার কোনো ক্ষতি করার চিন্তাও করবে না। তাকে লাঞ্ছিত করবে না, তার প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করবে না এবং তার দোষ ধরার জন্য বা তার ক্ষতি করার জন্য তার পিছে লেগে থাকবে না। হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»

"'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা.) সুত্রে নাবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে ব্যক্তিই মুসলিম যার কথা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির সে ব্যক্তি যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করে।"[১৮]

মোট কথা, একজন মুমিন কখনো অন্য মুমিনের অকল্যাণ বা ক্ষতির চিন্তা করবে না। বরং সর্বদা অন্য মুমিনের কল্যাণ ও উপকার করার চেষ্টা করবে, যেমন চেষ্টা করে নিজের কল্যাণ ও উপকারের জন্য। এধরনের মনমানসিকতা ও কর্মতৎপরতা ব্যতীত কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না। এজন্যই হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

"আনাস (রা.) সূত্রে নাবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবেনা, যতক্ষণ না সে তার ভাইর জন্য তাই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[১৯]

---

১৭. বায়হাকী, শু'বুল ঈমান, অধ্যায় ৭৭, বাবু ফী আঁই ইউহিব্বুর রাজুলু লি আখিহিল মুসলিমি মা তুহিব্বু লি নাফসিহি... হাদীছ নং ১০৬৩৭)

১৮. বুখারী, কিতাবুল ঈমান , বাবু আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিল লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি, হাদীছ নং ১০)

১৯. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাবুল ঈমানি আঁই ইউহিব্বা লি আখিহি মা ইউহিব্বু লি নাফসিহি, হাদীছ নং ১৩)

অতিরিক্ত হাসা

রাসূলুল্লাহ (সা.) অতিরিক্ত হাসতে নিষেধ করেছেন। কারণ অতিরিক্ত হাসলে অন্তর মরে যায়। সবসময় হাসাহাসি এবং হাসি তামাশা করলে মানুষ তার ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলে। তখন সে কোনো কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে না। হৃদয় দিয়ে কোনো কিছু অনুধাবন করা, অভিনিবেশসহ কিছু ভাবা, বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে সুক্ষ্ম বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, সুক্ষ্মদর্শিতা, দূরদর্শিতা প্রভৃতি হ্রাস পায়। ফলে কোনো কিছুর আভ্যন্তরীণ বিষয় এবং প্রকৃত অবস্থা অন্তর দিয়ে অনুভব করা তার জন্য সম্ভব হয় না। এ জন্য সে ভারত্ব হারিয়ে হালকা স্বভাবের লোকদেরর অন্তর্ভূক্ত হয়। তার হৃদয়ের প্রকৃত কার্যকারিতা বাস্তব অর্থে কার্যকর থাকে না। এটিকেই হাদীছে অন্তরের মৃত্যু বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, অতিমাত্রায় হাসাহাসি ও হাসিতামাশা আর হাসিখুশি ও প্রফুল্ল থাকা এক জিনিস নয়। হাদীছে প্রথমটিকে নিষেধ করা হয়েছে, দ্বিতীয়টিকে নয়।

শিক্ষা :

১. হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। কারণ হারামে লিপ্ত ব্যক্তির ‘ইবাদাত বন্দেগী আল্লাহ কবুল করেন না।

২. যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কারণ আল্লাহ যা ভাগ্যে রেখেছেন, তার বেশি পাওয়া যাবে না। সুতরাং দুনিয়া পওয়ার জন্য পেরেশান ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উচিৎ নয়।

৩. প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং তাদের সাথে সদাচার ও তাদের হক আদায় করতে হবে।

৪. নিজের ভালমন্দ ও অন্যের ভালমন্দকে একরূপ মনে করতে হবে। কারো ক্ষতি করার বা কাউকে কষ্ট দেওয়ার চিন্তাও করা যাবে না। বরং সর্বদা অন্যের উপকার করার চিন্তা করবে।

৫. ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ায় হাসি তামাশা বা অবহেলা করে সময় নষ্ট করা যাবে না, বরং সুচিন্তিতভাবে প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হবে এবং নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমীন। ■

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'মক্কা' 'ফক্কা' ইউনিভার্সিটি

আবুল আসাদ

পুরনো নোটবুক নাড়া চাড়া করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের একটা কথার উপর চোখ পরল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বাবু হরিপদ ভট্টাচার্য সন্ত্রাস দমন বিষয়ক তার এক লিখায় (দৈনিক খবর, ৮ ডিসেম্বর, '৯১) কুরআনের এক আয়াত নিয়ে মজা করেছিলেন, রসিকতা করেছিলেন। বিষয়টা হরিপদ বাবুর ভাষাতেই বলি: "সন্ত্রাস বন্ধের যে উদ্যোগ, স্বার্থহীন নেতা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তা তো সৎ মানুষের নেই। কেননা তার শাস্ত্রেই আছে, 'আমি তোমাকে বুদ্ধি দেইনি, কিন্তু অত্যল্প মাত্রায় দিয়েছি।' অত্যল্প মাত্রার বুদ্ধি দিয়ে সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপ বন্ধ করা যাবে না। এই উপসংহারে পৌঁছে ভট্টাচার্য বাবু সন্ত্রাস বন্ধের জন্য আল্লাহকে ডাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আরও আরও মজার বিদ্রুপের কথা বলেছিলেন হরিপদ বাবু তার লিখায়। রসময় আলাপের পোশাক পরে বিশ্বাসীদের বুকে ছুরি মারার মত কার্যটি তিনি সুকৌশলে সম্পাদন করেন। কর্ম সম্পাদনটা সুকৌশল হলেও তার ভিত্তিটা অন্ধের হাতি দেখার মতোই অজ্ঞতাপ্রসূত এবং অমূলক। কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে আমি এখন কোন বড় আলোচনায় যেতে চাচ্ছিনা। আলোচনা করতে চাই তাঁর অন্য একটি মজার কথা নিয়ে। তাঁর সে মজার কথাটি বলা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি উক্তি কোট করেছিলেন যাতে শাস্ত্রী বলেন, "এসেছিলাম 'ডাক্কা' (Dacca) ইউনিভার্সিটিতে, এসে দেখি 'মক্কা' ইউনিভার্সিটি, কিছুদিন পরে দেখলাম 'ফক্কা' ইউনিভার্সিটি, এখন দেখছি 'ধাক্কা' (Dhaka) ইউনিভার্সিটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই উক্তির কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে হরিপদ বাবু লিখেছিলেন, 'যে রকম পন্ডিত সমাবেশ হয়েছিল, তাতে ঢাকা একটা অসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠতে পারতো, কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আবর্তে পরে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভালো ভালো অধ্যাপকের কেউ কেউ অল্পদিনের মধ্যেই চলে গিয়েছিল।'

লক্ষণীয় বিষয় হলো, বাবু হরিপদ ভট্টাচার্য তার কথায় উহ্য রেখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কে বা কারা করেছিল। অবশ্য কথাটা তিনি বলে দিয়েছেন অন্যভাবে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উদ্ধৃতির মাধ্যমে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'আশাভঙ্গ' এবং ভালো অধ্যাপকদের 'চলে' যাওয়া (নিশ্চয়ই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাওয়া) প্রমাণ করে সেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য মুসলমানরাই দায়ী ছিল। মুসলমানরাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

'ডাক্কা' ইউনিভার্সিটিকে 'মক্কা' এবং 'ফক্কা' ইউনিভার্সিটিতে পরিণত করেছিল। বাবু হরিপদ ভট্টাচার্যের এই পরিবেশনা দেখে মনে হয় হর-শাস্ত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিষণ রকম দরদী ছিলেন, শুধু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্ভব রকম ক্ষতি সাধন করেছিল।

বাবু হরিপদ ভট্টাচার্য তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী অধ্যাপক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস জানার কথা। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অতীত সম্পর্কে ঐ উপস্থাপনাকে তার বিকৃত চিন্তা বলেই আমি অভিহিত করব। তিনি তার এই চিন্তা দ্বারা আমাদের নতুন প্রজন্মকে প্রতারিত করতে চেয়েছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'ডাক্কা' বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা' বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেখেছেন। দেখারই কথা। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্বেষী তার কলকাতার সহকর্মীরা বিদ্রুপ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা' বিশ্ববিদ্যালয় বলে ডাকতেন। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাবুদের কাছে যে 'মক্কা' বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছিল তার কারণও আছে। সে কারণগুলোর একটার সুন্দর বিবরণ পাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন-ভারতীয় ইতিহাস-সংস্কৃতির অধ্যাপক শ্রী দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এর বক্তব্যে। ভাণ্ডারকর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া তার এক বক্তৃতায় বলেন, 'কলিযুগে বৃদ্ধগঙ্গা' নদীর তীরে হরতগ নামক একজন অসুর জন্মগ্রহণ করবে। মূল গঙ্গার তীরে একটি পবিত্র আশ্রম আছে। সেখানে অনেক মুনি-ঋৃতি এবং তাদের শীষ্যগণ বাস করেন। এই অসুর সেই আশ্রমটি নষ্ট করার জন্য নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে একে একে অনেক শিষ্যকে নিজ আশ্রয়ে নিয়ে যাবে। যারা অর্থ লোভে পূর্বের আশ্রম ত্যাগ করে এই অসুরের আকর্ষণে বৃদ্ধ গঙ্গার তীরে যাবে, তারাও ক্রমে অসুরত্ব প্রাপ্ত হবে এবং তারা অশেষ দুর্দশাগ্রস্ত হবে।

শ্রী ভাণ্ডারকর এই বক্তব্যে 'হরতগ' বলতে বুড়িগঙ্গা (বৃদ্ধগঙ্গা) তীরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন 'ফিলিপ হরতগ'। আর মূল গঙ্গা তীরের 'পবিত্র আশ্রম' বলতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝানো হয়েছে। এই বিষয়টি জানার পর শ্রী ভাণ্ডার্করের বক্তব্যের অর্থ সবার কাছেই পরিষ্কার। তাদের কাছে এখন আরো পরিষ্কার হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শ্রী ভাণ্ডারকরদের কত ঘৃণা থাকলে তারা বলতে পারেন যে, কলকাতা থেকে অসুরদের স্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা চাকুরী করতে যাবে তারা সকলেই অসুর হয়ে যাবে। এই যখন অবস্থা তখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'ফক্কা' বিশ্ববিদ্যালয় তো বলবেনই। অসুরদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'ফক্কা' খুব বড় গাল নয়।

শ্রী ভাণ্ডারকরের এই উক্তিটি ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তার স্মৃতি কথা 'জীবনের স্মৃতিদ্বীপে' উল্লেখ করেছেন। কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সভায় শ্রী ভাণ্ডারকর ওই বক্তব্য রেখেছিলেন, সে সভায় রমেশচন্দ্র মজুমদারও উপস্থিত ছিলেন। ঐতিহাসিক রমেশ বাবুর লেখায় আরো আমরা জানতে পারি যে, 'কলকাতার বাবুরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিরকম

বিরোধী ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে নস্যাৎ করার জন্য তারা কি পরিমাণ উঠে পড়ে লেগেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রহিত করায় পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তাদের সান্তনা দেয়ার জন্য তাদের আরেকটি দাবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ সরকার এগিয়ে আসে। হতাশার মধ্যে আনন্দের সংবাদ ছিল এটা মুসলমানদের জন্য। কিন্তু পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের এই আনন্দে কলকাতার বাবুরা ক্ষোভে ফেঁসে ওঠেন। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেন, 'মুসলমানরা এতে খুবই খুশি হলেন বটে, কিন্তু হিন্দুদের মনে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। সাধারণতঃ যারা রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকতেন তারাও এই প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাসবিহারী ঘোষ ও গুরুদাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের প্রধান যুক্তি হলো এই যে, প্রশাসন ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার বদলে এখন একটি সাংস্কৃতিক বিভাগ করা হচ্ছে। ফলে এতে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।' ক্রমে এই আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করলে বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হিন্দুদের এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, তাদের এমন আশঙ্কার কোন কারণ নেই। ঢাকায় যে বিশ্ববিদ্যালয় হবে তার ক্ষমতা ও অধিকার ঢাকা শহরের দশ মাইল পরিধীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।" (জীবনের স্মৃতিদ্বীপে)

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই উদ্ধৃতি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি হিন্দুদের এই বৈরীতার প্রকাশ ঘটা ছাড়াও আরও একটা বিষয় পরিষ্কার হলো যে, তাদের চরম বৈরীতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিকলাঙ্গ বা অবরুদ্ধ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ক্ষমতা ও অধিকারের সীমানা ঢাকার বাইরে ছিল না। সুতরাং শ্রী ভাণ্ডারকর, শ্রী আশুতোষ মুখার্জি, শ্রী বাসবিহারী ঘোষ, শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুধু বিরোধীতাই করেননি এর অপূরণীয় ক্ষতিসাধনও করেছিলেন। এই বিষয়টা নিশ্চিতই প্রমাণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাদের সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা', 'ফক্কা বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যাদানকারী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তা যেমন বেমালুম চেপে গেছেন তেমনি আমাদের হরিপদ ভট্টাচার্য বাবুও।

কলকাতার শ্রী ভাণ্ডারকর বাবুদের মত ঢাকার শ্রী হরিপদ বাবুদের সাম্প্রদায়িকতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কম যন্ত্রনা দেয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রার প্রতিপদে তারা বাধ সেধেছে এবং নস্যাৎ করতে চেষ্টা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের সব প্রয়াসকে। কোন মুসলিম লেখক নয়, খোদ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের (সিন্ডিকেটের) সদস্যদের মধ্যে অর্ধেক ছিলেন মুসলমান এবং অর্ধেক ছিলেন হিন্দু। প্রফেসররা কোর্টের সদস্য ছিলেন। বার লাইব্রেরীর অনেক উকিল রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এর সভ্য হতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন যে হিন্দুরা ভালো চোখে দেখেননি এ কথা পূর্বেই বলেছি। কারণ হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল বঙ্গভঙ্গ রহিত করায় মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে অনেকটা তা পূরণ করার জন্যেই এই নতুন

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পদে হিন্দুগণই অধিষ্ঠিত ছিলেন তথাপি কোর্টের হিন্দু সভ্যরা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রীতির চোখে দেখেননি। বাইরে এ বিষয়ে যে আলোচনা হতো, কোর্টের সবাই হিন্দু সভ্যদের বক্তৃতায় তা প্রতিফলিত হতো। অবশ্য ভোটের সময় জয়লাভের ব্যাপারে আমরা (ঢা.বি'র পক্ষের শক্তি) অনেকটা নিশ্চিত ছিলাম মুসলমান সদস্য (৫০%) এবং হিন্দু শিক্ষক সদস্যরা এক্ষেত্রে মিলে (সিন্ডিকেটের) হিন্দু সদস্যদের (৫০%) চেয়ে অনেক বেশি ছিলেন।" (জীবনের স্মৃতিদ্বীপে)

উল্লেখ্য, সাংস্কৃতির অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্তির মত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও হরিপদ ভট্টাচার্যের মতো সত্য গোপন না করে সত্য কথাটা সামনে এনেছেন। তার কথায় পরিষ্কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা বা বৈরীতা হিন্দুরা করেছে।

আমি জানি, ইতিহাসের এ সাক্ষ্য ভট্টাচার্য বাবুদের কানেও যাবেনা, চোখেও পড়বেনা। যে মানসিকতা পরবশ হয়ে তিনি পবিত্র কোরআনের আয়াত নিয়ে রসিকতা করেছেন, সে মানসিকতার কারণেই ইতিহাস নিয়ে মিথ্যাচার তারা চালিয়েই যাবেন। তা যান, কিন্তু একটা কথা বলি, হরিপদ বাবু কোরআনের যে আয়াত উদ্ধৃত করেছেন, তার অর্থ বোঝার চেষ্টা তার অন্ধ মন করেনি। করলে তিনি দেখতে পেতেন মানুষকে তার প্রয়োজনীয় বিষয় জানার জ্ঞানটুকু দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই প্রয়োজনীয় জ্ঞানটুকু অর্জন করাই মানুষের এখনো শেষ হয়নি। মানুষ নিজ দেহের সৃষ্টি জটিলতার উৎস, কেন, কিভাবে- তার কতটুকু মানুষ জানে? চারপাশের জড় ও জীব জগতের পারস্পরিক জীবন সম্পর্ক ও সৃষ্টি কৌশলের কতটুকু জানতে পেরেছে মানুষ? শুধু দুনিয়া নয়, ১৪ বিলিয়ন লাইট ইয়ার্স ব্যাসের দৃষ্টিযোগ্য মহাবিশ্বের সৃষ্টি জটিলতা ও বিস্ময়কর সর্বসমতা সম্পর্কে কতটুকু জানে মানুষ? এই মহাবিশ্বের বাইরে এর চারপাশ ঘিরে নিঃশব্দ, নিঃসীম অন্ধকারের অজানা, অপরিচিত সীমানা বিজ্ঞান দেখে না, যেখানে বিজ্ঞানের কোন শক্তি, কোন জ্ঞানই প্রবেশ করতে পারে না, তার সম্পর্কে তো মানুষ কিছুই জানতে পারে না। তাছাড়া মানুষের নিজ থেকে মহাবিশ্ব যে বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি তার ৪% মাত্র দৃষ্টিযোগ্য, যা মানুষ দেখে, অবশিষ্ট ৯৬% অদৃশ্য, যে সম্পর্কে কোন জ্ঞান মানুষের নেই। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, মানুষের জ্ঞান অল্পই। আল কুরআন তো এ কথাই বলেছে। হরিদাস বাবুরা বিজ্ঞান পড়ুন, তার সাথে সাথে পাক-সাফ হয়ে একবার কুরআন শরীফ পড়ে দেখুন। পাক-সাফ হওয়ার দরকার এই কারণে যে, সব সৃষ্টির স্রষ্টা, সব সৃষ্টির প্রতিপালক ও প্রত্যাবর্তনস্থল সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজে পবিত্র এবং মানুষের ভেতর-বাইরের পবিত্রতা পছন্দ করেন। আর আল-কুরআন সৃষ্টির জন্যে তাঁরই পবিত্র মেসেজ। যা মানুষ পেয়েছে তাঁরই মনোনীত প্রতিনিধি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) মাধ্যমে। ■

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য

ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী

জীবজগতে সর্বত্র সমাজবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। পীপিলিকা, মৌমাছি, পাখি, বন-জঙ্গলে পশুদের মধ্যেও দলবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। নিজেদের প্রয়োজনেই হয়ত তারা দলবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং শত্রুর হাত থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষাও এর অন্যতম কারণ।

মানুষ জন্মগতভাবেই সামাজিক জীব। জন্ম মূহুর্ত থেকেই মানুষকে অন্যের সহযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়। একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা, পরস্পরের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজনীয়তা, অর্থনৈতিক বিনিময়, পারস্পরিক লেনদেন প্রভৃতি কারণে মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। এ সকল কারণে সমাজের বাইরে গিয়ে জীবন যাপন করা মানুষের জন্য প্রায় অসম্ভব।

একই সমাজে বাস করা সত্ত্বেও মানুষের সভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, রুচিবোধ, মেজাজ-মর্জি, চিন্তা-চেতনা, 'আকিদা-বিশ্বাস প্রভৃতি বৈচিত্রময়। সে কারণে সমাজের সকলকে সমন্বয় করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, শৃংখলা বিধান, পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিরূপ প্রভাব থেকে সমাজকে সুরক্ষার জন্য সামাজিক নিয়ম-বিধান থাকা একান্তই জরুরী। অবশ্য রাজনৈতি চিন্তা ও আদর্শিক ভিন্নতার কারণে সে বিধি-বিধানও বিভিন্ন হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে ইসলামী জীবন বিধান উল্লেখযোগ্য।

ইসলাম একটি নির্ভূল ও মানব স্বভাবের অনুকূল জীবন বিধান। কারণ এটি মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ প্রদত্ত এ জীবন একদিকে সম্পূর্ণ নির্ভূল , অপরদিকে তা মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অধিকন্তু তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য কল্যাণকর। কারণ আল্লাহ ভুলের উর্ধে, তিনি মানুষের স্রষ্টা হওয়ার কারণে মানব স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল এবং তিনি সকলের স্রষ্টা হওয়ার কারণে তাঁর বিধান সকলের জন্যই অনুকূল।

ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী সমাজ এক অনুপম স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ সমাজ সুসম, সুন্দর, ইনসাফপূর্ণ ও কল্যাণকর বিষয়াবলীতে সমৃদ্ধ। নিম্নে এ সমাজের কতিপয় বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

১. ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা এবং সম্মান ও স্নেহ এ সমাজের অলংকার :

ইসলাম তার অনুসারী মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পককে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বক্তব্য হলো, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"নি:সন্দেহে মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই।"[১]

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে বারণ করে, সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদের প্রতি আল্লাহ শীঘ্রই রহম করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২]

এ সমাজের প্রতিটি সদস্য শ্রদ্ধা ও স্নেহের উজ্জল মহিমায় ভাস্বর। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، وَيَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ছোটকে স্নেহ, বড়কে শ্রদ্ধা, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করেনা, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।"[৩] অন্য হাদীছে রয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ»

"'আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তুমি যমীনবাসীর প্রতি রহম করো, তাহলে আসমানবাসীও তোমার প্রতি রহম করবেন।"[৪] তিনি আরো বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعًا، تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ، تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَقِلَّ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ»

"আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে আবু হুরায়রা (হারাম বা সংশয়পূর্ণ জিনিস থেকে) সতর্ক থাক, তাহলে তুমি লোকদের মধ্যে বেশী 'ইবাদাতকারী গণ্য হবে, স্বল্পে তুষ্ট থাক তাহলে লোকদের মধ্যে অধিক শুকর আদায়কারী হবে, মানুষের জন্য তাই পছন্দ কর যা তোমার নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি মুমিন হবে, তোমার প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ কর তাহলে তুমি মুসলিম হবে। আর কম হাসবে, কারণ অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে।"[৫]

ইসলামী সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক এতটাই গভীর হয় যে, নিজের ভাল-মন্দ ও পছন্দ-অপছন্দের সাথে অন্যদেরকেও একাকার করে নেয়।

---

১. ৪৯, সূরা আল হুজরাত : ১০।
২. ৯, সূরা আত্ তাওবা :৭১।
৩. তিরমিযি, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাবু মা জাআ ফি রাহমাতিস সিবইয়ান, হাদীছ নং ১৯২১।
৪. হাকেম, আল মুসতাদরাক, কিতাবুত তাওবা ওয়াল ইনাবাহ, হাদীছ নং ৭৬৩১।
৫. ইবন মাজাহ, কিতাবুয যুহ্দ, বাবুল ওয়ারা' ওয়াত্ তাকওয়া, হাদীছ নং ৪২১৭।

মদিনায় হিজরাতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরী করে দিয়েছিলেন, তাই হলো ইসলামী সমাজের প্রকৃষ্টতম নমুনা। যেখানে আনসারগণ তাদের মুহাজির ভাইর জন্য আশ্রয়, বাসস্থান, জীবিকা প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছিলেন। কেউ কেউ কৃষি জমির একাংশ মুহাজির ভাইকে দিয়ে দিয়েছিলেন এবং মক্কার লোকেরা কৃষি কাজ জানতো না বলে তাদেরকে কৃষি কাজেও সহযোগিতা করেছিলেন। এমন কি সা'দ ইবন রাবী' (রা.) তাঁর মুহাজির ভাই আব্দুর রাহমান ইবনু 'আউফকে অর্ধেক সম্পদ ভাগ করে দেওয়ার এবং দু'জন স্ত্রীর মধ্য হতে যাকে তার পছন্দ হয় তাকে তালাক দিয়ে তার সাথে বিবাহ দেওয়ারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[৬]

ইসলামের মূলনীতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হলে মায়া-মমতা, সম্মান ও স্নেহবোধ, পারস্পরিক ভালবাসা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে হিংসা-বিদ্বেষ বিদূরিত হয়ে সুসম্পর্কের সেতুবন্ধন স্থাপিত হবে।

২. পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ :

ইসলামী সমাজে স্বার্থপরতার কোন স্থান নেই। বরং এ সমাজ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এ সমাজে একজন আরেক জনের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে। "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" এটি হলো এ সমাজের চালিকাশক্তি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"আর তোমরা কল্যাণকর ও আল্লাহভীতির কাজে একে অপরকে সাহায্য কর এবং পাপাচার ও সীমালংঘনমূলক কাজে একে অন্যকে সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।"[৭] এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ»

"আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) অত্যাচারিতকে আমরা সাহায্য করব তাতো বুঝলাম, কিন্তু অত্যাচারীকে আমরা সাহায্য করব কিভাবে? তিনি বললেন, তার দু'হাত ধরবে (এবং অত্যাচার থেকে বিরত রাখবে)।"[৮]

ইসলামী সমাজে দরিদ্রদের প্রয়োজনে বৃত্তবানরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। অসহায়দের সহায়তায় সামর্থবানরা এগিয়ে আসে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের যাকাত ব্যবস্থা এক অনন্য ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে দু:স্থ-দরিদ্র ও অসহায়দের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে যাকাত অনন্য ভুমিকা পালন করে বলেই যাকাতকে ইসলামের 'সেতুবন্ধন' বলা হয়েছে।

---

৬. বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, বাবু ইখায়িন নাবিয়্যি (সা.) বায়নাল মুহাজিরিনা ওয়াল আনসার, হাদীছ নং ৩৭৮০।
৭. ৫, সূরা আল মায়িদা : ২।
৮. বুখারী, কিতাবুলল মাজালিম, বাবু আ'ইন আখাকা জালিমান আও মাজলুমান, হাদীছ নং ২৪৪৪।

৩. কল্যাণ কামনা :

সামাজিক সমস্যা ও অশান্তির মূল কারণ হলো পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, অন্যের ক্ষতি করার মানসিকতা ইত্যাদি। এ সকল কারণেই পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়, পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা তৈরী হয়, দলাদলি ও কোন্দল সৃষ্টি হয় এবং ফলশ্রুতিতে সমাজ অশান্ত হয়। ইসলাম এগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অপরদিকে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করতে নির্দেশ দিয়েছে। সকলের জন্য কল্যাণ কামনা ইসলামী সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল কুরআনে মুমিনদের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"যারা পরস্পরকে সত্য ও সবরের উপদেশ দেয়।"[৯] হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

"জারীর বিন 'আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান ও প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার জন্য আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছি।"[১০]

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ « الدِّينُ النَّصِيحَةُ » قُلْنَا لِمَنْ قَالَ « لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

"তামীম আদ্ দারী (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী (সা.) বলেন, দীন হলো কল্যাণ কামনা। আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুসলিমদের নেতৃবৃন্দ ও তাদের সাধারণ লোকদের জন্য।"[১১]

মুসলিমদের অভিবাদন পদ্ধতিতেও শান্তি ও কল্যাণ কামনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক মুসলিমের সাথে অন্য মুসলিমের দেখা হলে বলতে হয়, আস্সালামু 'আলাইকুম - "আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" আর উত্তরে বলতে হয়, ওয়া 'আলাইকুমুস্ সালাম - "আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।" মূলত: কল্যাণ ও শান্তি কামনা ও তার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় রত থাকা এ সমাজের প্রতিটি সদস্যের অন্যতম দায়িত্ব।

সকলেই সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করার ফলে সমাজ থেকে অকল্যাণ দূর হয়ে কল্যাণের আবহ তৈরী হয়। যখন প্রত্যেকেই অন্যের ক্ষতি ও অকল্যাণ না করে কল্যাণ ও উপকার করার চর্চা করতে থাকে, তখন সমাজে অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধ হয়ে কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর তখনই মানুষ প্রকৃত শান্তির স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম হয়।

৪. অন্যকে অগ্রাধিকার দান :

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা আরও এক ধাপ এগিয়ে নিজের চেয়ে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

---

৯. ১০৩, সূরা আল'আসর : আয়াত-৩।
১০. বুখারী, কিতাবুল ইমান, বাবু কাউলিন নাবিয়্যি (সা.) আদ্ দীনু আন নাসীহাতু... হাদীছ নং ৫৭।
১১. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানি আন্নাদ্ দীনা আন্ নাসীহাত, হাদীছ নং ৫৫।

নিজের চেয়ে অন্যকে গুরুত্ব দেওয়া, নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া ইসলামী সমাজের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য। অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ বিধায় এ কাজটি মুসলিমগণ অত্যন্ত গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে করে থাকে। ফলে মুসলিম সমাজে শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও মানবিকতার এক অনুপম পরিবেশ বিরাজিত থকে। মুমিনদের এ বৈশিষ্ট্যকে আল্ কুরআনে বিবৃত করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্বেও তারা নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়।"[১২]

একটি চমৎকার ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। একদা জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের নিকট এসে বলল, আমি খুব ক্ষুধার্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর স্ত্রীদের কাছে পাঠালেন, কিন্তু তাদের কাছে খাওয়ানোর মত কোন কিছুই পেলেন না। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এ ব্যক্তিকে রাত্রে কে মেহমানদারী করবে? আল্লাহ তার প্রতি রহম করবেন। এ কথা শুনে আবু তালহা (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল। অত:পর তিনি তাকে নিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, আল্লাহর রাসূলের মেহমান, তাকে সম্মান করো। স্ত্রী বলল, আমার নিকট সন্তানদের খাবার ব্যতীত আর কিছুই নেই। তিনি স্ত্রীকে বললেন, তোমার খাদ্য প্রস্তুত করো, বাতি প্রজ্জলিত করো এবং সন্তানরা রাতে খাবার চাইলে তদেরকে ঘুমিয়ে দাও। সে খাবার প্রস্তুত করলো, বাতি জালালো এবং তার সন্তানদেরকে ঘুমিয়ে দিল। অত:পর সে বাতি ঠিক করার ভান করে উঠে গেল এবং তা নিভিয়ে দিল। এরপর তারা দু'জন দেখাতে লাগল যে, তারাও খাচ্ছে। আর তারা দু'জনও রাতে না খেয়ে থাকল। সকাল বেলা সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট গেলে রাসলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমাদের দু'জনের কাজে আল্লাহ রাত্রিতে হেসেছেন অথবা আল্লাহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন।"[১৩]

ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় এর চেয়েও চিত্তাকর্ষক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এ যুদ্ধে ইকরামা (রা.)সহ তিনজন পিপাসায় মৃত্যুবরণ করেন। পিপাসায় কাঁতর অবস্থায় একজন পানি পান করতে চাইলে তাঁর নিকট পানি নিয়ে যাওয়া হলো। তখন অন্য আরেকজনও পানির জন্য চিৎকার করল। এমতাবস্থায় প্রথম ব্যক্তি পানি পান না করে তা দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট নিয়ে যেতে বললেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট পানি নিয়ে যাওয়া হলে তৃতীয় আরেক ব্যক্তি পানি চাইলেন। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি পানি পান না করে তা তৃতীয় ব্যক্তির নিকট নিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির নিকট পানি নিয়ে যেয়ে দেখা গেল তিনি মারা গিয়েছেন। সে উক্ত পানি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট ফিরে এনে দেখেন তিনিও মারা গেছেন। অত:পর

---

১২. ৫৯, সূরা আল হাশর : ৯।
১৩. বুখারী, কিতাবুত মানাকিবিল আনসার, বাবু ওয়া ইউছিরুনা 'আলা আনফুসিহিম হাদীছ নং ৩৭৯৮; মুসলিম, কিতাবুল আশরিবাহ, বাবু ইকরামিজ জায়ফি ওয়া ফাজলি ইছারিহি, হাদীছ নং ২০৫৪।

পানি নিয়ে প্রথম ব্যক্তির নিকট এসে দেখেন তিনিও মারা গেছেন।[১৪] আল কুরআনে আল্লাহ বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

"পূর্ব-পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরানোই শুধু পূণ্যের কাজ নয়, বরং প্রকৃত পূণ্যের কাজ হলো তার কাজ, যে ঈমান আনে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি এবং ঈমান আনে ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি। আর সম্পদের প্রতি মুহাব্বত স্বত্বেও সে সম্পদ ব্যয় করে ইয়াতিম, মিসকীন, পথিক, প্রার্থী এবং দাস মুক্তির জন্য।"[১৫]

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا - إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

"খাদ্যের প্রতি নিজদের ভালবাসা স্বত্বেও তারা সে খাদ্য মিসকীন, ইয়াতিম ও বন্দীদেরকে খাওয়ায়। তারা বলে, আমরা তোমাদেরকে খাওয়াই কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আমরা এ জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা কমনা করি না।"[১৬]

নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দান, নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে গুরুত্ব প্রদান এবং নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যকে রক্ষা করার প্রবণতা ইসলামী সমাজের এক অনুপম চেতনা। এ সমাজে কেউ স্বার্থপর হয়না, হয় স্বার্থত্যাগী। আর আত্ম ত্যাগের এ চেতনা সমাজকে করে মহিমান্বিত, জীবনকে করে তুলে মধুর ও আনন্দঘন।

৫. সকলের প্রতি সদাচরণ :

একে অন্যের প্রতি সদাচরণ করা ইসলামী সমাজের সৌন্দর্যের এক অনুপম নিয়ামক শক্তি। সকলের প্রতি সুন্দর আচরণ ও উত্তম পন্থায় কথা বলার জন্য ইসলাম সকলকে নির্দেশ দান করে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায় ও উত্তম আচরণের এবং আত্মীয়গণের হক প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা তা গ্রহণ করো।"[১৭]

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ "তোমরা যদি সদাচার করো, তাহলে সে সদাচার তোমাদের নিজেদের জন্যই হবে।"[১৮]

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। আর সদাচার করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচারীদেরকে ভালবাসেন।"[১৯]

---

১৪. তাফসীরু ইবনে কাছীর, সূরা হাশর, ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।
১৫. ২, সূরা আল বাকারা : ১৭৭।
১৬. ৭৬, সূরা আদ্ দাহর : ৮-৯।
১৭. ১৬, সূরা আন :৯০।
১৮. ১৭, সূরা বানী ইসরাঈল : ৭।
১৯. ২, সূরা আল বাকারা : ১৯৫।

এ প্রসঙ্গে হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ "

'আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সৃষ্টি হলো আল্লাহর পরিবার। সুতরাং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি সে, যে তাঁর পরিবারের প্রতি উত্তম আচরণ করে।"[২০]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ.

"'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যারা করুণাকারী তাদের প্রতি রাহমান (আল্লাহ) করুণা করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি করুণা কর, তাহলে আসমানবাসী তোমাদের প্রতি করুণা করবেন। করুণা রাহমান (আল্লাহ) হতে উৎসারিত। যে ব্যক্তি তা (অন্যের জন্য) অবিচ্ছিন্ন রাখে, আল্লাহও (তার জন্য) তা অবিচ্ছিন্ন রাখেন, আর যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করে আল্লাহও তার থেকে তা ছিন্ন করে দেন।"[২১]

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ»

"জারীর ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তার প্রতি করুণা করেন না, যে মানুষের প্রতি করুণা করেনা।"[২২]

বিনীত ও মার্জিত আচরণ মানবতার ভূষণ। সুন্দর আচরণ পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে। পক্ষান্তরে অসুন্দর ও অমার্জিত আচরণ সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। ইসলামের মূল শিক্ষা হলো কারো কথা, কাজ বা আচরণের দ্বারা কেউ যেন কষ্ট না পায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অন্যকে কষ্ট দেয় এমন আচরণ সমাজের জন্য যেমন ক্ষতিকরা তেমনি আখিরাতেও তা ক্ষতির করণে হবে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ»؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»

---

২০. বায়হাকী, শু'বুল ঈমান, বাবু ফি তা'আতি উলিল আমর, ফাসলু ফি নাসীহাতিল ওলাতি ওয়া ওয়া'জিহিম, হাদীছ নং ৭০৪৮।

২১. তিরমিযি, কিতাবুল বির্‌রি ওয়াস সিলাহ, বাবু মা জা'আ ফি রাহমাতিন নাস, হাদীছ নং ১৯২৪।

২২. বুখারী, কিতাবুত্ তাওহীদ, বাবু, কাউলিল্লাহি তা'আলা কুলিদ'উল্লাহা আবিদ 'উর রাহমান, হাদীছ নং ৭৩৭৬।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের বললেন, তোমরা কি জান, নি:স্ব কে? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নি:স্ব যার দিরহামও (নগদ অর্থ) নেই, কোন সম্পদও নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার উম্মাতের মধ্যে নি:স্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম, যাকাতসহ হাযির হবে এবং তার সাথে সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত (হত্যা) করেছে, কাউকে মারধর করেছে, ইত্যাদি অপরাধও নিয়ে আসবে। সে তখন বসবে এবং তার সৎকাজ থেকে এ ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে, ও ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে। এভাবে সম্পূর্ণ বদলা নেয়ার পূর্বেই তার সৎকাজ নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদের গুনাহসমূহ তার উপর চাপানো হবে, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।[২৩]

অন্য এক হাদীছে এসছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فُلَانَةَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا فَقَالَ: «لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ فِي النَّارِ» ، قِيلَ: فَإِنَّ فُلَانَةَ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَتَصَدَّقُ بِأَثْوَارٍ مِنْ أَقِطٍ وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا بِلِسَانِهَا قَالَ: «هِيَ فِي الْجَنَّةِ»

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন , নাবী (সা.)কে বলা হলো, অমুক নারী দিনের বেলায় সিয়াম পালন করে এবং রাত জেগে 'ইবাদাত করে। কিন্তু সে তার কথার দ্বরা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, তাতে তার কোনো কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামী। আবার বলা হলো, অমুক নারী ফরজ সালাত আদায় করে, রমযানের সিয়াম পালন করে এবং কিছু পনির দান করে। কিন্তু সে তার কথার দ্বারা কাউকে কষ্ট দেয় না। তিনি বলরেন, সে জান্নাতী।[২৪]

মানুষের আচরণের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ভাল আচরণ যেমন বাল প্রভাব ফেলে অনুরূপভাবে মন্দ আচরণও সমাজে মন্দ প্রভাব প্রতিফলিত করে। এ জন্য ইসলাম উত্তম আচরণের প্রতি এত বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছে। এমনকি যুক্তি-তর্কের ক্ষেত্রেও ইসলাম উত্তম পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

তোমার রবের পথে আহবান করো প্রজ্ঞা ও উত্তম ভাষণের দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়। (১৬, সূরা আন্ নাহল :১২৫) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ

"উত্তম পন্থায় মন্দের প্রতিবাদ করো।" (২৩, সূরা আল্ মুমিনুন :৯৬)

---

২৩. আবওয়বু সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়ার রিকাক ওয়াল ওয়ারা', বাবু মা জাযঅ ফি শার্নিল হিসাব ওয়াল কিসাস, হাদীছ নং ২৪১৮।

২৪ . হাকিম, আল্ মসিতাদ্রাক 'আলাস সাহীহাইন, হাদীছ নং ৭৩০৫।

৬. ঐক্য ও সংহতি :

ইসলাম একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত জাতি গঠন করে। বিচ্ছিন্নতা, দলাদলি, পারস্পরিক বিভেদ ইত্যাদিকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হলো,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা। আর তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে পরস্পরে শত্রু। অত:পর আল্লাহ তোমাদের আন্তরসমূহে হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ।"[২৫]

৭. নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন :

সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলার কারণ হলো অন্যায়, অনাচার, জুলুম, নিপীড়ন, দর্নীতি ও দুষ্কর্ম। এগুলোর মূল কারণ হলো নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়। তদানিন্তন সমাজে এবং বর্তমান সমাজেও মানবিক বিপর্যয়, মানবাধিকার লংঘন এবং অন্যায় জুলুমের মূল কারণ এটি। এজন্য মুহাম্মদ (সা:) মানুষের নৈতিক চরিত্র সংশোধন ও গঠনের দিকে মননিবেশ করেন। তিনি বলেন, **إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ** "উন্নত নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।"[২৬] তিনি আরো বলেন **خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.** "লোকদের মধ্যে সেই উত্তম, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।"[২৭]

তিনি নিজেই ছিলেন অনুপম সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। তাঁর চারিত্রিক মাধূর্য, সত্যবাদিতা, সততা ও আমানতদারীতার জন্য ছোট বেলাতেই মক্কাবাসী তাঁকে 'আল আমীন' ও 'আস্সাদিক' উপাধি দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে আল কুরআনে ঘোষণা করেন **وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ** "আবশ্য আবশ্যই তুমি সুমহান চরিত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।"[২৮] মানব চরিত্রের পরিশুদ্ধকরণ রাসূল হিসেবে তাঁর অন্যতম দায়িত্ব ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"যেমন তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান এবং তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, তোমাদেরকে শিক্ষা দেন সে সকল বিষয়, যা তোমরা জানতে না।[২৯]

---

২৫. ৩,সূরা আলু 'ইমরান : ১০৩।
২৬. বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, হাদীছ নং ২০৭৮২, আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত।
২৭. কানযুল 'উম্মাল, হাদীছ নং ৫২৬৮। ইবন 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত।
২৮. ৬৮, সূরা আল কলম : ৪।
২৯. ২, সূরা আল বাকারা : ১৫১।

তিনি তদানিন্তন অসভ্য আরবের অসৎ চরিত্রের মানুষগুলোকে পরিশুদ্ধ করে পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী করেছিলেন।

এভাবে তিনি নৈতিক চরিত্রে চরম অধ:পতিত এক অসভ্য জাতিকে পূঁতিগন্ধময় গহবর থেকে টেনে তুলে সভ্যতার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন, যারা বিশ্বকে এক নতুন সভ্যতা ও শান্তিময় সমাজ উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর নৈতিক চরিত্র গঠনের এ কর্মসূচী এমন এক নৈতিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল, যার প্রবল প্রভাবে পশুত্ব ও বর্বরতা বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিল এবং চারিদিকে সভ্যতা, সৌজন্যতা, শালীনতা ও মানবিকতার সুন্দরতম আবহ তৈরী হয়েছিল। যা অন্যায়, অশান্তি ও নির্মমতা দূর করে, ন্যায়, প্রশান্তি ও মায়া-মমতার এক অনুপম পরিবেশ তৈরী করেছিল। যার পরশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ পরম প্রশান্তি লাভে ধন্য হয়েছিল।

এ নৈতিক বিপ্লব সাধনে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন, কারণ তিনি মানুষের মনজগত ও চিন্তাজগতে পরিশুদ্ধি আনতে পেরেছিলেন। তিনি মানুষের মনে আল্লাহর ভয় এবং আখিরাতের জবাবদিহির তীব্র অনুভূতি জাগ্রত করতে পেরেছিলেন। এ দু'টির ভয় একজন মানুষকে অন্যায় থেকে নিবৃত করার জন্য সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণদানকারী ও পাহারাদারীর কাজ করেছে। ফলে সমাজের জন্য ভাল ব্যতীত মন্দের কোন চিন্তাই তারা করতে পারেনি।

৮. এ সমাজ একটি ন্যায় ভিত্তিক সমাজ :

জনগণের মধ্যে ইনসাফ কায়েম ও সকলের প্রতি ন্যায় বিচার নিশ্চিত করাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। কারণ ইনসাফ কায়েম ব্যতীত সমাজে শান্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধি আদৌ সম্ভব নয়। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

"নি:সন্দেহে আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও মানদন্ড, যাতে লোকেরা ইনসাফ কায়েম করতে পারে।"[৩০] শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) কে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ "আর তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।"[৩১]

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"যদি তুমি (হে নাবী) ফায়সালা কর, তাহলে তাদের মাঝে ফায়সালা কর ন্যায়সংগতভাবে। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।"[৩২] মুমিনদেরকেও

---

৩০. ৫৭, সূরা আল হাদীদ ; ২৫।
৩১. ৪২, সূরা শুরা : আয়াত-১৫।
৩২. ৫, সূরা আল মায়িদা : ৪২।

আল্লাহ তা'আলা ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা আমানতসমুহ স্বীয় হকদারের নিকট সোপর্দ কর। আর যখন লোকদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করবে, তখন ফায়সালা করবে ন্যায়ের সাথে।"[৩৩] অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"বস্তুত: আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের এবং নিকটাত্মীয়দেরকে হক প্রদানের। আর নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অন্যায় ও সীমালংঘন থেকে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"[৩৪]

এমনকি নিজের, পিতা-মাতার বা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও ন্যায় ও সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার উপর মুমিনদেরকে অটল-অবিচল থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ন্যায়ের প্রতিকূলে নিজের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। তারা ধনী বা গরীব যাই হোক, আল্লাহই তাদের জন্য অধিক কল্যাণকারী। সুতরাং ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।"[৩৫]

কথা বলতে হলেও সঠিক-সত্য ও ন্যায় কথা বলতে হবে।

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"যখন তোমরা কথা বলবে, ন্যায় কথা বলবে, যদিও নিকটাত্মীয় হোক। আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এতদ্বারা তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখো।"[৩৬]

এমনকি শত্রু বা শত্রুপক্ষের সাথেও ন্যায়ানুগ ও ইনসাফের ভিত্তিতে সকল কিছু সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

---

৩৩. ৪, সূরা আন নিসা : ৫৮।
৩৪. (১৬, সূরা আন নাহল : ৯০)
৩৫. ৪, সূরা আন নিসা : ১৩৫
৩৬. ৬, সূরা আল আন'আম : ১৫২।

"কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ থেকে বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত না করে। ইনসাফ করো, এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটতর, আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে খবরদার।"[৩৭]

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সকল ক্ষেত্রে সর্বাস্থায় ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে সবকিছু সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে। ফলে এ সমাজে অন্যায়-জুলুম দূর হয়ে ন্যায়ের ফলগুধারা সর্বত্র এক অনাবিল প্রশান্তির আবহ তৈরি করে। মানুষ নিষ্পেষণের নিগড় থেকে নিস্কৃতি পায়। ন্যায় বিচারের ফলে সবল-দুর্বল সকলেই তাদের স্ব স্ব অধিকার স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে পারে।

৯. সৎ কাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজে বাধাদান :

সমাজকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ-সুন্দর করা এবং সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি, স্থিতি ও নিরাপত্তার জন্য অন্যায়-অনাচার, জুলুম-নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনা, দুর্নীতি-দুরাচার, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, ফিৎনা-ফাসাদসহ সকল প্রকার কলূষতা হতে সমাজকে মুক্ত রাখা জরুরী। যাতে জনগণ উৎকণ্ঠা মুক্ত হয়ে ও প্রশান্ত চিত্তে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সমাজের জন্য দু'টি জিনিষ খুবই জরুরী। এক. নিরাপত্তা ও শান্তি বিনষ্টকারী অপতৎপরতা প্রতিরোধ করা। দুই. নিরাপত্তা ও শান্তির আবহ সৃষ্টিকারী পরিবেশ তৈরী করা ও রাখা। এ জন্য অসৎ ও অকল্যাণকর কাজকে সমাজে প্রচলিত হতে না দেওয়া আর প্রচলিত থাকলে তা বিদূরিত করা। পক্ষান্তরে সৎ ও কল্যাণকর কাজের ব্যাপক প্রচলন করা ও তা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মধ্যে যেন এমন একটি দল থাকে, যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং সৎ কাজের আদেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তারাই হবে সফলকাম।"[৩৮]

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরা হলে উত্তম জাতি, মানবমন্ডলীর কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে আবির্ভুত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর ঈমান রাখবে আল্লাহর প্রতি।"[৩৯]

উপসংহার : উপরে যে সকল মূলনীতি ও বৈশিষ্টের বর্ণনা পেশ করা হলো, তা ইসলামী সমাজের নৈতিক ভিত্তি। এসকল ভিত্তির উপর কোনো সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে তা হবে একটি কল্যাণকর জনবান্ধব সমাজ। মানবতার কল্যাণে এ ধরনের সমাজ বিনির্মাণ খুবই জরুরী। এজন্য সকলকে তা প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসা প্রয়োজন। বিশেষ করে সরকার এর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। কেননা এধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই মানবতার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। ■

---

৩৭. ৫, সূ আল মায়িদা : ৮।
৩৮. ৩,সূরা আলু 'ইমরান : ১০৪।
৩৯. ৩,সূরা আলু 'ইমরান : ১১০।

ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্নীতিমুক্ত সমাজব্যবস্থা গঠনে নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম

ভূমিকা

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা একটি রাষ্ট্রের নৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির প্রমাণ। ইসলামে ক্ষমতা ও নেতৃত্ব কেবল রাজনৈতিক সুবিধা নয়, বরং একটি আখলাকি আমানত, যা শাসককে আল্লাহ ও জনগণের কাছে জবাবদিহি দায়িত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে। নির্বাচিত সরকারের কার্যক্রমের প্রতিটি স্তর- প্রশাসন, বিচার, অর্থনীতি ও সামাজিক কল্যাণ, শুদ্ধতা, সততা এবং যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে নির্দেশ আছে যে, ঘুষ-দুর্নীতি, অযোগ্য নিয়োগ, স্বজনপ্রীতি ও অসততা সমাজের ন্যায় ও স্থিতিশীলতা ধ্বংস করে। এ প্রেক্ষাপটে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সরকারের দায়িত্বের বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা নৈতিক নীতি, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম।

দুর্নীতির সংজ্ঞা

'দুর্নীতি' শব্দের আভিধানিক অর্থ: নীতিবিরুদ্ধ, কুনীতি ও অসদাচরণ ইত্যাদি।[১] এর আরবী প্রতিশব্দ আল-ফাসাদ।[২] আল-কুরআনে শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ.

"তারা পৃথিরীতে ফাসাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কখনই পছন্দ করেন না।"[৩]

'দুর্নীতি'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Corruption।[৪]

সাধারণত দুর্নীতি বলতে নৈতিকতা বা নীতির বিরোধী কোনো কাজ করাকেই বুঝানো হয়ে থাকে। দুর্নীতির সংজ্ঞা নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে নানা মতভেদ রয়েছে। যেমন :

দুর্নীতির সংজ্ঞা প্রদানে Oxford advanced Learners dictionary তে বলা হয়েছে "Willing to use their power to do dishonest or illegal things in return money or to get an advantage." ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ ক্ষমতা, অর্থ প্রাপ্তি বা কোন

---

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক [প্রধান সম্পাদক], *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৬১৫।

২. ইবন মানযুর আল-আফ্রীকী, *লিসানুল আরব* (মিশর: দারুল হাদীস, ২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০০; মুনীর আল-বা'লাবাক্কী, *আল-মওয়ারিদ* (বৈরূত: দারুল 'আলম লিল-মালায়্যীন, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ২২০।

৩. সূরা আল মায়িদা, ৫ : ৬৪।

৪. A. T. Dev, *students favourite dictionary*, English to Bengali (Calcutta: Mallennium edition, 2001), p. 318.

অবৈধ সুযোগ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অসৎ বা কোন অসঙ্গত কাজে ব্যবহার করাকে বলা হয় দুর্নীতি।[৫]

এ সম্পর্কে ভারতের বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী রামনাথ শর্মা বলেন, "In corruption a person willfully neglected his specified duty in order to have an undue advantage." অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলাই দুর্নীতি।[৬]

Social work dictionary তে বলা হয়েছে, "Corruption is in political and public service administration, the abuse of office for personal gain usually through bribery, extortion, influence pedding and special treatment given to some citizens and not to others." রাজনৈতিক ও সরকারী প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন, প্রভাব বা ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অফিস আদালতকে ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভের জন্য অপব্যবহার করাকে বুঝায়।[৭]

ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন বলেন, দুর্নীতির মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা লাভবান হলেও সামগ্রিকভাবে সমাজ ও অর্থনীতির ওপর এর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাই সার্বিক বিচারে দুর্নীতি সব সময়ই নেতিবাচক ও পরিত্যাজ্য। সম্পদ পাচার, নিয়ম বর্হিভূতভাবে সম্পদ অর্জন, ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা এবং দারিদ্রের কারণে দুর্নীতি, মজুদদারী এবং ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ প্রভৃতি সকল অপকর্মই দুর্নীতি।[৮]

মোটকথা, ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভের জন্য গণপ্রশাসনের অপব্যবহারকেই দুর্নীতি বলা হয়। অর্থাৎ সকল পর্যায়ে ঘুষ, বলপ্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন, ব্যক্তি বিশেষের অবৈধ ও অসংগত সুবিধা গ্রহণ এবং নীতি বহির্ভূত সকল কাজই দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত।

দুর্নীতির কারণসমূহ

ক. **উচ্চাভিলাষী জীবনের মোহঃ** দুর্নীতির অন্যতম কারণ হলো উচ্চাভিলাষ। অল্প সময়ে প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য মানুষ দুর্নীতি করে থাকে।

খ. **রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতাঃ** বাংলাদেশে যে সকল কারণে দুর্নীতি হয়, তন্মধ্যে একটি হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ ও সামাজিক অস্থিরতা। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে প্রার্থীরা ভোটারদের প্রতারিত ও প্রভাবিত করে থাকে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য। জয়ী হওয়ার পর সে অর্থ বহুগুণ

---

৫. A. s. Horn by, *Oxford advanced Learners dictionary* (New York: Oxford University Press, 1993), p.২৪৪.

৬. Ramanath Sharma, *Indian Social problems* (Bombay : Media promoters and publishers pvt. Ltd. 1982), p. 101.

৭. মোঃ আতিকুর রহমান, *বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা ও সরকারী নীতি* (ঢাকা : আল-কুরআন পাবলিকেন্স, ২০০০ খৃ.), পৃ. ৩৩৫।

৮. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সমাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খৃ.) ৪০৮-৪১০।

বাড়িয়ে উসূল করার জন্য ব্যাপকভাবে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। এছাড়া রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দুর্নীতিবাজরা ব্যাপকভাবে দুর্নীতি করে থাকে।

গ. **নৈতিক শিক্ষার অভাব:** সমাজে দুর্নীতির মতো জঘন্য কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার অন্যতম একটি প্রধান কারণ হলো নৈতিক শিক্ষার অনুপস্থিত। এটি দুর্নীতি বিস্তারের বিশেষ কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

ঘ. **কর্মকর্তা, কর্মচারীদের অপর্যাপ্ত বেতন ও পারিশ্রমিক :** কথায় আছে অভাবে স্বভাব নষ্ট। বাংলাদেশে কর্মজীবী মানুষের পারিশ্রমিক তাদের কর্ম ও চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত। এজন্য তারা বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

ঙ. **কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা:** বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য অনেকে অবৈধ উপায়ে এবং ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করে। আর চাকরি পাওয়ার পর তারা ঘুষের টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ঘুষের লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে। ফলে দুর্নীতি ক্রমশ বাড়তে থাকে।

চ. **অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা:** পৃথিবীর বেশির ভাগ স্থানে একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় হলো, যার যত বেশী অর্থ সে তত প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী। শিক্ষা বা কোনো পেশার মূল্যায়ণ সেখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। তাই সামাজিক মর্যাদা লাভের নেশায় অনেকে দুর্নীতির মাধ্যমে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করে থাকে এবং তখন নীতি-নৈতিকতা ভীষণভাবে উপেক্ষিত হয়।

দুর্নীতিমুক্ত সমাজব্যবস্থা গঠনে নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

দুর্নীতিমুক্ত সমাজব্যবস্থা গঠনে নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব ও কতর্বব্যের পরিধি ব্যাপক। নিম্নে এ সম্পর্কে কাতিপয় দিক তুলে ধরা হলো :

১. যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্ব প্রদান

একটি সুষ্ঠু ও কল্যাণ রাষ্ট্রপরিচালনায় Merit-based Appointment তথা যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্ব প্রদান ইসলামী শাসননীতির মৌলিক নীতি। নির্বাচিত সরকার জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে প্রশাসনিক, বিচারিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্বসমূহ এমন ব্যক্তিদের নিকট অর্পণ করবে, যারা দক্ষ, সৎ ও নৈতিকভাবে যোগ্য। স্বজনপ্রীতি, দলীয় আনুগত্য বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে নিয়োগ দিলে আমানতের খিয়ানত হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি জন্ম নেয়। ইসলাম নেতৃত্বকে মর্যাদা নয় বরং জবাবদিহিমূলক আমানত হিসেবে বিবেচনা করে। অতএব রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও দুর্নীতিমুক্ত কাঠামোর জন্য যোগ্যতা ও আমানতদারিত্ব অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার উপযুক্তদের নিকট পৌঁছে দাও; আর যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে।"[৯]

আলোচ্য আয়াতে الْأَمَانَاتِ শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ; এর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রক্ষমতা, প্রশাসনিক দায়িত্ব

৯. সূরা আন-নিসা ৪:৫৮।

ও সরকারি পদকে বুঝায়। এছাড়া আয়াতের অন্য একটি শব্দ إِلَىٰ أَهْلِهَا অর্থাৎ যিনি সে দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত ও সক্ষম তাঁর নিকট তা অর্পণ করতে হবে এটি প্রমাণ করে। এই আয়াত শাসক ও বিচারকদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে প্রযোজ্য; অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা যোগ্য ব্যক্তির হাতে দেওয়া ফরজ দায়িত্ব। আবার আয়াতের দ্বিতীয় অংশে ন্যায়বিচারের নির্দেশ প্রমাণ করে যে, যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান ন্যায় প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।

মহান আল্লাহ অন্য এক আয়াতে ঘোষণা করেন :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"তাদের একজন বলল, হে আমার পিতা! তাকে কাজে নিযুক্ত করুন; নিশ্চয় আপনি যাকে নিয়োগ করবেন, তার মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও আমানতদার।"[১০]

আলোচ্য আয়াতে মূসা (আ.)-এর প্রসঙ্গে দুইটি মৌলিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে: **القوي** তথা সামর্থ্য ও **الأمين** তথা সততা/বিশ্বাসযোগ্যতা। ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই দুই বৈশিষ্ট্যই প্রশাসনিক নিয়োগের মৌলিক মানদণ্ড। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

"যখন দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।"[১১]

আলোচ্য হাদীসের ভাষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, এটি সরাসরি রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. স্পষ্ট করে বলেছেন : অযোগ্য নিয়োগ সমাজ ধ্বংসের লক্ষণ। এ ছাড়া এখানে "**الأَمْرُ**" শব্দটি শাসনক্ষমতা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব বোঝায়। অর্থাৎ যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ না করা শুধু প্রশাসনিক ভুল নয়, বরং নৈতিক ও ধর্মীয় বিচ্যুতি। নেতৃত্ব চাওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ.

"হে আবদুর রহমান ইবনু সামুরা! তুমি নেতৃত্ব (পদ) প্রার্থনা করো না।"[১২]

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. নেতৃত্বকে সম্মান নয়, বরং দায়িত্ব ও জবাবদিহির বিষয় হিসেবে দেখিয়েছেন। তাই যে ব্যক্তি ক্ষমতা লাভের জন্য লালায়িত হয়, তার মধ্যে প্রায়ই ব্যক্তিস্বার্থ কাজ করে। তাই নির্বাচিত সরকারের কর্তব্য হলো পদলোভী নয়, বরং দক্ষ ও নীতিবান ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া।

২. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আইনের সমতা নিশ্চিতকরণ

রাষ্ট্রে দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো আইনের অসম প্রয়োগ। যখন ক্ষমতাবান ব্যক্তি আইন থেকে অব্যাহতি পায় এবং দুর্বল ব্যক্তি কঠোর শাস্তি ভোগ করে, তখন সামাজিক নৈতিকতা ভেঙে পড়ে। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ন্যায়বিচার কেবল একটি প্রশাসনিক নীতি নয়; এটি ঈমানের দাবি। নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হলো বিচারব্যবস্থাকে স্বাধীন রাখা, দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখা এবং সকল নাগরিকের জন্য সমান আইন নিশ্চিত করা। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন অসম্ভব।

---

১০. সূরা আল-কাসাস ২৮:২৬।
১১. বুখারী, সহীহ, হাদীস ৫৯।
১২. বুখারী, হাদীস নং- ৭১৪৬; মুসলিম, হাদীস নং- ১৬৫২।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতা বা আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়।"[১৩]

এই আয়াতে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকে ঈমানের দাবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। **قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ** শব্দটি নির্দেশ করে দৃঢ়ভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় অবিচল থাকা। এমনকি আত্মীয়স্বজন বা নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধেও ন্যায় বজায় রাখতে হবে। তাফসীরবিদরা বলেন, এই আয়াত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার ভিত্তি স্থাপন করে। ন্যায়বিচার ছাড়া দুর্নীতিমুক্ত সমাজ কল্পনাতীত।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগণ এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোনো সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত; আর দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর শাস্তি কার্যকর করত।"[১৪]

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. পষ্ট করেছেন যে, আইনের বৈষম্যমূলক প্রয়োগ জাতির পতনের কারণ। এখানে দুর্নীতির একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ তুলে ধরা হয়েছে, আর তা হলো ক্ষমতাবানদের দায়মুক্তি প্রদান। ইসলামী রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন না হলে সমাজ ধ্বংস হওয়া অনিবার্য। অতএব নির্বাচিত সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো আইন প্রয়োগে সমতা নিশ্চিত করা।

৩. ঘুষ ও আর্থিক দুর্নীতির মূলোৎপাটন

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো ঘুষ ও অবৈধ আর্থিক লেনদেন বন্ধ করা। ঘুষ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে বিকৃত করে, যোগ্য ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করার পথ খুলে দেয়। নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হলো এমন আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করা, যাতে ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান উভয়ই কঠোরভাবে দমন করা হয়। ইসলামে ঘুষ কেবল নৈতিক অপরাধ নয়, বরং এটি স্পষ্ট হারাম। অর্থনৈতিক দুর্নীতি সমাজে বৈষম্য ও অবিচার সৃষ্টি করে, যা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না এবং তা বিচারকদের নিকট পৌঁছে দিও না, যাতে তুমি জেনে শোনে অন্যের সম্পদ গ্রাস করতে পারো।"[১৫]

---

১৩. সূরা আন-নিসা ৪:১৩৫।
১৪. বুখারী, হাদীস নং-৩৪৭৫; মুসলিম, হাদীস নং-১৬৮৮।
১৫. সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৮।

এই আয়াতে ঘুষের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ দ্বারা বোঝানো হয়েছে বিচারক বা কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে সম্পদ প্রদান। এটি সরাসরি ঘুষের প্রতি ইঙ্গিত করে। আল্লাহ এখানে অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণকে হারাম ঘোষণা করেছেন। ঘুষের মাধ্যমে বিচার প্রভাবিত করা সমাজে অবিচার সৃষ্টি করে। তাফসীরকারগণ বলেন, এই আয়াত প্রশাসনিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ করে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

"রাসূলুল্লাহ সা. ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতাকে অভিশাপ করেছেন।"[১৬]

এখানে لَعَنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা কঠোর নিষেধাজ্ঞা নির্দেশ করে। ঘুষের ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয় পক্ষকেই দায়ী করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, দুর্নীতি কেবল প্রশাসনিক নয়; সামাজিক অপরাধও বটে। নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হলো এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে ঘুষের সুযোগই থাকবে না।

৪. জবাবদিহিতা ও প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকর

দুর্নীতির অন্যতম কারণ হলো ক্ষমতার অপব্যবহার এবং জবাবদিহিতার অভাব। যখন কোনো প্রশাসনিক কর্মকর্তা তার কর্মকাণ্ডের জন্য দায়বদ্ধ থাকে না, তখন দুর্নীতির বিস্তার ঘটে। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তি আল্লাহ ও জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সরকারকে এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে সরকারি সিদ্ধান্ত, অর্থব্যয় ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বচ্ছভাবে পর্যালোচিত হবে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ.

"তুমি তাদের থামাও; নিশ্চয় তারা জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৭]

আয়াতটি মূলত আখিরাতের জবাবদিহিতার প্রসঙ্গে হলেও নীতিগতভাবে দুনিয়াবি দায়বদ্ধতার ভিত্তি নির্দেশ করে। مَسْئُولُونَ শব্দটি প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তির জবাবদিহিতাকে স্পষ্ট করে। রাষ্ট্রপর্যায়ে এর অর্থ ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। কারণ জবাবদিহিতা ছাড়া সুশাসন সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৮]

আলোচ্য হাদীসে শাসক, প্রশাসক ও পরিবারপ্রধান সকলের দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলে সে জবাবদিহির আওতায় আসবে। এটি আধুনিক প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও অডিট ব্যবস্থার ইসলামী ভিত্তি, দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনে এ নীতি অপরিহার্য।

---

১৬. সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩৫৮০; সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং- ১৩৩৭।
১৭. সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:২৪।
১৮. বুখারী, হাদীস নং-৮৯৩; মুসলিম, হাদীস নং-১৮২৯।

৫. জনসম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ

রাষ্ট্রের সম্পদ জনগণের আমানত। নির্বাচিত সরকার কর, ভ্যাট, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈদেশিক সহায়তা থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে, তা ব্যক্তিগত নয় বরং সমষ্টিগত অধিকার। উন্নয়ন প্রকল্পে অতিরিক্ত ব্যয়, অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা, আত্মসাৎ ও বাজেট ফাঁকি এসবই দুর্নীতির রূপ। ইসলামে অপচয় নিন্দিত এবং জনসম্পদ অপব্যবহার গুরুতর গুনাহ। রাষ্ট্র যদি আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় না রাখে, তাহলে প্রশাসনিক দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। তাই বাজেট স্বচ্ছতা, নিরীক্ষা ব্যবস্থা এবং দায়িত্বশীল ব্যয়নীতি অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই; আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।"[১৯]

অপচয় ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার সমাজে বৈষম্য ও দুর্নীতি সৃষ্টি করে। আল্লাহ অপচয়কে শয়তানের কাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন অনর্থক কথা, অতিরিক্ত প্রশ্ন এবং সম্পদের অপচয়।"[২০]

৬. চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা

নির্বাচিত সরকার জনগণের সঙ্গে এক প্রকার সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে। নির্বাচনী অঙ্গীকার ভঙ্গ, নীতি পরিবর্তনে অসততা এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন রাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ধ্বংস করে। ইসলাম চুক্তি রক্ষাকে ঈমানের অংশ হিসেবে গণ্য করে। দুর্নীতির একটি সূক্ষ্ম রূপ হলো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও অঙ্গীকারে অসততা। তাই রাষ্ট্রকে নৈতিক ও আইনি অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ করো।"[২১]

আলোচ্য আয়াতের **الْعُقُودِ** শব্দটি সকল প্রকার চুক্তি ও অঙ্গীকারকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত। চুক্তি রক্ষা না করলে সামাজিক আস্থা নষ্ট হয়। দুর্নীতিমুক্ত শাসনব্যবস্থায় অঙ্গীকারপালন একটি অপরিহার্য বিষয়।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

"মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি: কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে, আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে।"[২২]

---

১৯. সূরা আল-ইসরা ১৭:২৭।
২০. বুখারী, হাদীস নং-১৪৭৭; মুসলিম, হাদীস নং-৫৯৩।
২১. সূরা আল-মায়িদা, ৫:১।
২২. বুখারী, হাদীস নং-৩৩; মুসলিম, হাদীস নং-৫৯।

৭. জুলুম ও ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ

ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমন, নাগরিক অধিকার হরণ এসবই জুলুমের অন্তর্ভুক্ত। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সরকারকে ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে। জুলুম প্রশাসনিক দুর্নীতির অন্যতম রূপ। ইসলামে জুলুম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং এর পরিণতি ভয়াবহ বলে সতর্ক করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ.

"তোমরা জালিমদের প্রতি ঝুঁকো না, অন্যথায় আগুন (জাহান্নাম) তোমাদের স্পর্শ করবে।"[২৩]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"জুলুম থেকে বেঁচে থাকো; নিশ্চয় জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করবে।"[২৪]

৮. সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশুদ্ধতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুদভিত্তিক অর্থনীতি ধনী-গরিব বৈষম্য বৃদ্ধি করে, শোষণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং আর্থিক দুর্নীতির পথ প্রশস্ত করে। নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হলো এমন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা, যা ন্যায়ভিত্তিক এবং উৎপাদনমুখী। ইসলাম সুদকে কেবল আর্থিক অনিয়ম নয়, বরং সামাজিক অবিচারের উৎস হিসেবে বিবেচনা করে। তাই দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনে সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রবর্তন একটি মৌলিক বিষয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হও। আর যদি তা না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।"[২৫]

সুদের বিরুদ্ধে "যুদ্ধের ঘোষণা" করা হয়েছে, যা এর ভয়াবহতা নির্দেশ করে। এ থেকে প্রমাণিত, সুদ অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক অবিচারের মাধ্যম। রাষ্ট্রপর্যায়ে সুদনির্ভর কাঠামো দুর্নীতি ও বৈষম্য বাড়ায়। তাই ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা সরকারের ঈমানি দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

"রাসূলুল্লাহ সা. সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ করেছেন এবং বলেছেন, তারা সবাই সমান (অপরাধে)।"[২৬]

---

২৩. সূরা হূদ, ১১:১১৩।
২৪. মুসলিম, হাদীস নং- ২৫৭৮।
২৫. সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৮-২৭৯।
২৬. মুসলিম, হাদীস নং- ১৫৯৮।

৯. সামাজিক কল্যাণ ও দারিদ্র্য বিমোচন

দারিদ্র্য দুর্নীতির একটি সামাজিক কারণ। যখন মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না, তখন অবৈধ উপার্জনের প্রবণতা বাড়ে। নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হলো দু:স্থ-দরিদ্র ও অসহায়দের পাশে দাড়ানো এবং তাদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের ব্যবস্থা করা। এজন্য তহবিল গঠন করা। এক্ষেত্রে বিত্তবানদের দান, যাকাত, সাদাকা ও উশর প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। ইসলাম কল্যাণরাষ্ট্র ধারণাকে সমর্থন করে, যেখানে দুর্বল ও অসহায়দের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা দুর্নীতিমুক্ত সমাজের ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

"সাদাকাসমূহ তো দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত এবং যারা এর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত তাদের জন্য।"[২৭]

আলোচ্য আয়াতে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ আছে। তাই সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করতে সম্পদের সুষম বণ্টন অপরিহার্য। এগুলো দুর্নীতির সামাজিক শিকড় দুর্বল করে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি পেট ভরে খেয়ে রাত্রিযাপন করে অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, সে আমার প্রতি ঈমান আনেনি।"[২৮]

১০. নৈতিক শিক্ষার বিস্তার ও জনচেতনা বৃদ্ধি

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো নৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি। শুধু আইন ও শাস্তি যথেষ্ট নয়; বরং জনগণ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে। ইসলাম চরিত্র ও আখলাককে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা দেয়। নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হলো শিক্ষা নীতি ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং দায়িত্ববোধের সংস্কৃতি সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। নৈতিক চেতনা থাকলে দুর্নীতি ও অসততা কমে যায়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

"যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, সে সফল হয়েছে।"[২৯]

দুর্নীতির মূল কারণ কেবল প্রশাসনিক দুর্বলতা নয়; বরং নৈতিক অবক্ষয়ও এর গুরুত্বপূর্ণ কারণ। নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হলো শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতা, সততা ও আল্লাহভীতি জাগ্রত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। আইনের কঠোরতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও অভ্যন্তরীণ নৈতিক চেতনা না থাকলে দুর্নীতি পুরোপুরি নির্মূল হয় না। ইসলাম আত্মশুদ্ধিকে সামাজিক সংস্কারের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। ব্যক্তি নৈতিকভাবে উন্নত হলে সমাজ ও রাষ্ট্রও সুশাসনের দিকে অগ্রসর হয়।

---

২৭. সূরা আত-তাওবা ৯:৬০।
২৮. মাজমাউজ ঝাওয়ায়িদ, হাদীস নং- ৮২৮১।
২৯. সূরা আশ-শামস, ৯:৯।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"[৩০]

এই আয়াত ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তনের মৌলিক নীতি নির্ধারণ করে। مَا بِأَنفُسِهِمْ দ্বারা বোঝানো হয়েছে অন্তরের বিশ্বাস, নৈতিকতা ও চরিত্র। তাফসীরবিদরা বলেন, বাহ্যিক আইন প্রয়োগের পাশাপাশি অন্তর্গত আত্মশুদ্ধি অপরিহার্য। সমাজে যদি সততা ও তাকওয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে দুর্নীতি স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়। এই আয়াত সামাজিক সংস্কারের আত্মিক ভিত্তি নির্দেশ করে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

"যে কেউ কোনো সৎ কাজে পথপ্রদর্শক হবে, তারও পুরস্কার হবে কাজটি করা ব্যক্তির সমান।"[৩১]

১১. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও প্রশাসনিক সতর্কতা

দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরকারকে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে। ইসলামিক রাষ্ট্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি একটি সামাজিক শিক্ষা। যা জনগণকে সতর্ক করে। সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক নেতারা অপরাধ করলে শাস্তি ভোগ করবে এবং ব্যক্তিগত, দলীয় বা অন্যকোনো কারণে অপরাধকে ক্ষমা করা হবে না। এতে সমাজে নৈতিক নিয়মের প্রতি সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং দুর্নীতি কমে।

আইনের প্রয়োগ যদি দুর্বল হয়, তবে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। শাস্তির ভয় না থাকলে অপরাধীরা সাহসী হয়ে ওঠে। সরকারের দায়িত্ব হলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর আইন প্রণয়ন এবং নিরপেক্ষভাবে তা প্রয়োগ করা। ইসলাম ন্যায়সংগত শাস্তিকে সামাজিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। শাস্তির উদ্দেশ্য প্রতিশোধ নয়, বরং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ প্রতিরোধ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

"হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।"[৩২]

এই আয়াতে শাস্তির সামাজিক উপকারিতা তুলে ধরা হয়েছে। حَيَاةٌ দ্বারা বোঝানো হয়েছে ন্যায়সংগত শাস্তি সমাজে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। তাফসীরকারগণ বলেন, আইন প্রয়োগে দুর্বলতা অপরাধ বৃদ্ধি করে। ন্যায়ভিত্তিক শাস্তি অপরাধীদের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। দুর্নীতির ক্ষেত্রেও কঠোর ও নিরপেক্ষ শাস্তি

---

৩০. সূরা আর-রাদ ১৩:১১।
৩১. মুসলিম, হাদীস নং- ১৮৭৩।
৩২. সূরা আল-বাকারা, ২:১৭৯।

সামাজিক শুদ্ধি নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এসেছে,

مَنْ كَانَ فِي الْحُكْمِ شَرًّا فَفِي النَّارِ

"যে ব্যক্তি শাসনের সময় অন্যায় করবে, সে জাহান্নামী হবে।"[৩৩]

১২. অবৈধ সম্পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ

রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণের মাধ্যম হতে পারে না। যখন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা প্রভাব প্রতিপত্তি ব্যবহার করে সম্পদ অর্জন করেন, তখন দুর্নীতি কাঠামোগত রূপ ধারণ করে। নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হলো অবৈধ সম্পদ অনুসন্ধান, সম্পদের হিসাবদানে বাধ্য করা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ইসলাম ক্ষমতার অপব্যবহারকে কঠোরভাবে নিন্দা করেছে। শাসক ও কর্মকর্তা উভয়ই তাদের সম্পদ ও কার্যক্রমের জন্য জবাবদিহির আওতাভুক্ত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আর যে কেউ আত্মসাৎ করবে, সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে উপস্থিত হবে।"[৩৪]

আলোচ্য আয়াতের يَغْلُلْ শব্দটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাতের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হলেও এটি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাফসীরকারগণ বলেন, সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ করা বড় গুনাহ। আখিরাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার আত্মসাৎকৃত সম্পদের জন্য জবাবদিহি করবে। এই আয়াত প্রশাসনিক সততা ও আর্থিক স্বচ্ছতার ভিত্তি স্থাপন করে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা ইসলামের দৃষ্টিতে কঠোর অপরাধ।

১৩. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সত্যপ্রকাশের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন সংবাদমাধ্যম নির্ভয়ে সত্য প্রকাশ করতে পারে, তখন প্রশাসনিক অনিয়ম দ্রুত প্রকাশ পায় এবং তা দূর করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করা, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করা এবং তথ্য গোপনের সংস্কৃতি দূর করা। তবে এই স্বাধীনতা যেন মিথ্যা প্রচার বা অপপ্রচারে পরিণত না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। ইসলাম সত্যবাদিতা ও তথ্য যাচাইয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। সুতরাং দায়িত্বশীল ও নৈতিক গণমাধ্যম দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا.

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো অসৎ ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করে নাও।"[৩৫]

এই আয়াত তথ্য যাচাইয়ের নৈতিক নির্দেশনা প্রদান করে। فَتَبَيَّنُوا অর্থ হলো যাচাই-বাছাই করা।

---

৩৩. বুখারী, হাদীস নং- ৮৮৫; মুসলিম, হাদীস নং- ১৮২৫।
৩৪. সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬১।
৩৫. সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:৬।

১৪. নাগরিক অধিকার ও ন্যায়সঙ্গত শাসন নিশ্চিতকরণ

দুর্নীতিমুক্ত সমাজে নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। যখন জনগণের মৌলিক অধিকার উপেক্ষিত হয়, তখন ক্ষমতার অপব্যবহার বৃদ্ধি পায়। নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হলো আইনের শাসন নিশ্চিত করা, মানবিক মর্যাদা রক্ষা করা এবং প্রশাসনিক বৈষম্য দূর করা। ইসলাম মানবমর্যাদাকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছে এবং শাসনব্যবস্থাকে ন্যায় ও নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে নির্দেশ দিয়েছে। নাগরিক অধিকার রক্ষা না হলে সামাজিক অস্থিরতা ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় ও সৎকর্মের নির্দেশ দেন।"[৩৬]

১৫. শূরা ও অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা

এককেন্দ্রিক ক্ষমতা দুর্নীতির ঝুঁকি বাড়ায়। যখন সিদ্ধান্ত এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, তখন স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দেয়। ইসলাম শাসনব্যবস্থায় পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করেছে। নির্বাচিত সরকারের উচিত গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণে বিশেষজ্ঞ, আলেম ও জনগণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করা। অংশগ্রহণমূলক শাসন স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার কমায়। শূরা বা পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থা নৈতিক ও প্রশাসনিক ভারসাম্য নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ.

"তাদের কার্যাবলি পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।"[৩৭]

আলোচ্য আয়াতের শূরা রা (شُورَىٰ) অর্থ পারস্পরিক পরামর্শ। তাফসীরবিদগণ বলেন, ইসলামী শাসনব্যবস্থার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো শূরা। একক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে সমষ্টিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় দুর্নীতি ও ভুল সিদ্ধান্ত কমায়।

১৬. ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক বণ্টন ও বৈষম্য হ্রাস

অর্থনৈতিক বৈষম্য দুর্নীতির অন্যতম উর্বর ক্ষেত্র। যখন সম্পদ একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন ক্ষমতা ও প্রভাবের অপব্যবহার বৃদ্ধি পায়। নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হলো ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন, করব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এবং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। ইসলাম সম্পদের সঞ্চালনকে সমাজকল্যাণের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। কল্যাণমুখী অর্থনীতি দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

"যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।"[৩৮]

এই আয়াতে সম্পদের একচেটিয়া সঞ্চালনের বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়েছে। **دُولَةً** শব্দটি বোঝায় এক গোষ্ঠীর হাতে সম্পদের ঘূর্ণায়মান অবস্থান। তাফসীরকারগণ বলেন,

---

৩৬. সূরা আন-নাহল ১৬:৯০।
৩৭. সূরা আশ-শূরা, ৪২:৩৮।
৩৮. সূরা আল-হাশর, ৫৯:৭।

ইসলামী অর্থনীতি সম্পদের সামাজিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে চায়। রাষ্ট্রের নীতিমালা এমন হওয়া উচিত, যাতে দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীও ন্যায্য অধিকার পায়। এই নীতির অবহেলা দুর্নীতি ও বৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।

১৭ .আইন প্রয়োগে সমতা ও বৈষম্যহীনতা

আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান এটি সুশাসনের মৌলিক নীতি। নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব হলো আইনের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করা। ইসলাম বিচার ও শাস্তির ক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থান বা বংশমর্যাদার ভিত্তিতে পার্থক্যকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

"তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায়ের কথা বলবে যদিও তা আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।"[৩৯]

এই আয়াত ন্যায়বিচারে নিরপেক্ষতার মৌলিক নীতি নির্দেশ করে। বিচারব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্ব আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী। সামাজিক মর্যাদা বা রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতে আইনের ভিন্ন প্রয়োগ ইসলাম অনুমোদন করে না। আইনের সমান প্রয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ।

১৮. আল্লাহভীতি ও নৈতিক নেতৃত্বের বিকাশ

সকল প্রশাসনিক কাঠামো ও আইন প্রণয়নের পরও যদি নেতৃত্বে আল্লাহভীতি ও নৈতিকতা না থাকে, তবে দুর্নীতি পুনরায় ফিরে আসে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বের উচিত আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া ও নৈতিক আদর্শে দৃঢ় থাকা। ইসলাম নেতৃত্বকে ক্ষমতা নয়, বরং দায়িত্ব ও পরীক্ষা হিসেবে বিবেচনা করে। দুর্নীতিমুক্ত সমাজের মূল চালিকা শক্তি হলো আল্লাহভিত্তিক নৈতিকতা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ করে দেন।"[৪০]

উপসংহার

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব একদিকে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক নীতি, অন্যদিকে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সংমিশ্রণ। যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ, স্বচ্ছ বাজেট ব্যবস্থাপনা, ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ, ন্যায়ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা, সামাজিক কল্যাণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এসব নীতির প্রয়োগ কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত। সরকারের নেতৃত্ব যদি আল্লাহভীতি, সততা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে পরিচালিত হয়, তবে জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায়, সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দুর্নীতির সম্ভাবনা প্রায় নির্মূল হয়। ■

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

---

৩৯. সূরা আল-আন'আম, ৬:১৫২।

৪০. সূরা আত-তালাক, ৬৫:২।

৫২ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

গাজার যুদ্ধ ও বর্তমান পরিস্থিতি

মীযানুল করীম

গাজায় যুদ্ধ চলছে। রেহাই পাচ্ছে না ছাত্র, ডাক্তার, জাতিসংঘের কর্মী, সাংবাদিক প্রমুখ। মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে হাসপাতাল, মিডিয়া সেন্টার, স্কুল, ত্রাণকেন্দ্র প্রভৃতি। কাতার ও মিসরসহ কয়েকটি আরব দেশের মধ্যস্থতায় মিসরে বৈঠকের পরও গাজার যুদ্ধ শেষ হচ্ছে না। গাজাকে ইসরায়েলের অংশ করার জন্য আমেরিকা উঠে পড়ে লেগেছে। আমেরিকা হচ্ছে ইসরায়েলের জন্মদাতা ও পালন কর্তা। গাজার প্রধান শক্তি হামাস কিছুটা ছাড় দিতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৪৮ সালে মিশর থেকে গাজা ভূ-খন্ড পাওয়ার পর ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠিত হয়। গাজা ফিলিস্তিনের মূল ভূ-খন্ড থেকে দূরে অবস্থিত একটি ছোট্ট ভূ-খন্ড। গাজার 'অপরাধ' একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে হামাসের নেতৃত্বে। পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আব্বাস হামাসের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁর নিয়ন্ত্রিত দুর্নীতি-কৃষ্ট পশ্চিম তীরেও ইসরায়েলি দমন পীড়ন অব্যাহত রয়েছে।

গণহত্যায় খরচ ১১২বিলিয়ন ডলার

গাজার যুদ্ধ এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ব্যয়ের। ইসরায়েলর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাব, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে চলা এই অভিযানে সংঘটিত গণহত্যার পেছনে ব্যয় করা হয়েছে প্রায় ১১২ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে শুধু গাজা যুদ্ধেই ব্যয় হয়েছে অন্তত ৪৮ বিলিয়ন ডলার। এই খরচ শুধু ইসরায়েলের নয়, যুক্তরাষ্ট্রেরও এমন তথ্য প্রকাশ পেয়েছে ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ২০২৫ সালের 'কস্ট অব ওয়ার' প্রতিবেদনে। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলি অভিযানে ৭৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এ ছাড়া এর মধে সরাসরি প্রতিরক্ষা ব্যয় ৭৭ বিলিয়ন ডলার, সম্পত্তির ক্ষতি পূরণে ১০.৫ বিলিয়ন, বেসামরিক খাতে ১৮ বিলিয়ন এবং সুদ পরিশোধে ৬ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে বলে জানান ইসরায়েলের সাবেক সামরিক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা গিল পিন খাস।

পিন খাসের মতে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে প্রায় ১০৮ বিলিয়ন ডলার-সামরিক সরঞ্জাম কেনায় বরাদ্দ করা হয়েছে। বিপুল রিজার্ভ সেনা মোতায়েনের প্রভাবও পড়েছে ইসরায়েলের অর্থনীতিতে। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির ২০২৫ সালের 'কস্ট অব ওয়ার' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে ২১.৭ বিলিয়ন ডলার সামরিক সহায়তা দিয়েছে।

ইসরায়েলের হামলায় ধ্বংসস্তূপের নগরীতে পরিণত হয়েছে গাজা। প্রায় ৯২ শতাংশ আবাসিক ভবন, ঐতিহাসিক স্থান ও অবকাঠামো মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, যা প্রায় ৬১ মিলিয়ন টনের বেশি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। ২ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান সংকটে মানবেতর জীবনযাপন করছে, যা এক মানবিক বিপর্যয়ের চরম রূপ। জাতিসংঘের হিসাবে গাজা পুনর্গঠনে অন্তত ৭০ বিলিয়ন ডলার লাগবে। ২০২৩

সালের ৭ অক্টোবর থেকে এই হামলা শুরু করে ইসরায়েল। হামাস নির্মূলের নামে এই হামলায় হতাহতের শিকার হয় উপত্যকার নিরীহ ফিলিস্তিনিরা।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত শত শত ইমাম

ইসরায়েলের ২ বছরের আগ্রাসনে নিহত শত শত ইমাম, খতিব ও কুরআন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে গাজায় শুরু হয়েছে রমজান। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতে, যুদ্ধে ৩১২ জন ইমাম, ধর্মীয় শিক্ষক ও খতিব নিহত হয়েছেন। ১০৫০ টির বেশি মসজিদ ধ্বংস হয়েছে। বহু এলাকায় মুসল্লিরী ধ্বংসস্তূপের পাশে কাঠ ও পলিথিনের তাঁবুতে নামাজ আদায় করছেন। খবর মিডলিস্ট মনিটরের।

গাজার সরকারি গণমাধ্যম প্রধান বলেন, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্বকে লক্ষ্য করেই হামলা চালানো হয়েছে, যাতে আত্মিক ও সামাজিক বন্ধন ভেঙ্গে দেয়া যায়। ধ্বংসের মাঝেও মানুষ ধর্মীয় আচার পালন অব্যাহত রেখেছে। ধমীয় স্থাপনা ও আলেমদের উপর হামলা আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, এসব আঘাত ধর্মীয় পরিচয় মুছে দিতে পারবেনা।

জীবনের স্মৃতি আঁকড়ে গাজার মানুষ

গাজায় এবারের রমজান এসেছে শোক, ক্ষতি আর টিকে থাকার সংগ্রাম নিয়ে। এক সময় যে মাস ছিল পারিবারিক মিলন, ইবাদত ও আনন্দের, তা পরিণত হয়েছে নিঃসঙ্গতা আর স্মৃতিচারণের সময়ে। টিআরটি ওয়ার্ল্ড জানায়, উত্তর গাজা শহরের এক বাসিন্দা বলেন, বাবার হাত ধরে মসজিদে তারাবির নামাজে যেতেন। এখন পরিবার হারিয়ে তিনি একাই রমজান পালন করছেন।

হামলায় বাবা-মা ও চার ভাইবোন হারানোর পর ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িটিই একমাত্র আশ্রয়। অনেকে তাঁবুতে বসবাস করে। রমজানের আচার ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। সানা আল-শারবাসে নামে এক মা জানান, স্বামীর পঙ্গুত্ব ও আয়ের সঙ্কটে সন্তানদের জন্য রমজানের সাজসজ্জা বা বিশেষ খাবার জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছে না। কাগজের তৈরি ফানুসই সান্ত্বনা। মসজিদ ধ্বংস, খাদ্য সঙ্কট ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও মানুষ ইফতার ও সাহরির সময় স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছে। হারানো মানুষের কথা মনে করেই গাজায় রমজান পার কর করছেন তারা।

বন্দীদের রোজা রাখতে বাধা দিচ্ছে ইসরাইল

রমজান মাসে ইসরাইলি কারগারগুলোতে ফিলিস্তিনি বন্দীদের সঠিক সময়ে রোজা রাখা ও ভাঙ্গার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। টিআরটি ওয়ার্ল্ড জানায় বন্ধী বিষয়ক কমিশনের ভাষ্য অনুযায়ী, পশ্চিমতীরের ওফের কারাগারে ফজর ও মাগরিবের সময় জানাতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে কারা কর্তৃপক্ষ। ফলে অনেক বন্দী সাহরি ছাড়াই রোজা রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। আইনজীবী খালেদ মাহজনেহ জানান, বন্দীদের রমজান শুরু হওয়ার খবর জানানো হয়নি। বহু বন্দী নির্ঘদিন ইফতারে পর্যন্ত খবার পাচ্ছেন না। কারাগারে ৯,৩০০ এর বেশি ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছেন। নারী ও শিশুও আছে। সংগঠনগুলোর মতে নির্যাতন, অনাহার ও চিকিৎসা অবহেলায় কারাগারে বহু বন্দীর মৃত্যু হয়েছে।

যুদ্ধ ও অবরোধে খরচ দ্বিগুণ

দুই বছরের ভয়াবহ যুদ্ধ ও বিপর্যয়ের মধ্যে গাজায় রমজান পালন করছেন ফিরিস্তিনিরা। যুদ্ধরিরতি থাকলেও প্রবেশে কড়াকড়ি অব্যাহত থাকায় ইফতার ও সাহরির খরচ দ্বিষণ হয়ে গেছে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যুদ্ধের আগে ইফতার ছিল সাধারণ পরিবারের নাগালের মধ্যে, সেখানে তা অধিকাংশ মানুষের জন্য কল্পনাতীত। মুরগির দাম বেড়েছে ৮০ শতাংশ, ডিমের দাম ১৭০ শতাংশ এবং শাকসবজির দামও ক্ষেত্রবিশেষে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

যুদ্ধবিরতির মধ্যেও হামলা অব্যাহত

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে যুদ্ধ শুরু হয়। ২০২৫ সালের ১০ অক্টোবর থেকে কার্যকর যুদ্ধবিরতির পর এ পর্যন্ত হামলায় ৬১৫ জন নিহত, এক হাজার ৬৫১ জন আহত হয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৭২৬ লাশ।

ফিলিস্তিনিদের জন্য নির্মাণ অনুমতি প্রায় বন্ধ

অধিকৃত পশ্চিম তীরে গত ১১ বছরে ফিলিস্তিনিদের জন্য মাত্র ৬৬টি র্নিমাণ অনুমতি দেয়া হয়েছে, অবৈধ ইসরায়েলি বসতকারীরা পেয়েছে ২২ হাজার অনুমতি এমন তথ্য প্রকাশ করেছে ইসরায়েলি দৈনিক হারেৎজ। প্রতিবেদনে বলা হয়ে, ২০০৯-২০২০ সালের মধ্যে এই বৈষম্যমূলক অনুমতি দেয়া হয়।

হামলার মধ্যেই গাজাবাসী রমজান শুরু করে

যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় ফিলিস্তিনিদের জন্য এটি ছিল তৃতীয় রমজান। একটি নড়বরে 'যুদ্ধবিরতির মধ্যে এবারের রমজান শুরু করেছিল গাজাবাসী। গাজাবাসী মাইসুনের ভাষায়, পরিস্থিতি পুরোপুরি শান্ত নয়। মাঝে মধ্যে গোলা বর্ষণ হচ্ছে। যুদ্ধের চরম সময়ের তুলনায় এখন গোলা বর্ষণের তীব্রতা কিছুটা কম। নিজের বাড়ি হারিয়ে মাইসুন দুই বছর ধরে এক শরণার্থী শিবির থেকে অন্য শিবিরে ঘুরছেন। মাইসুন বলেন, 'আমি প্রার্থনা করি যেন যুদ্ধ আর ফিরে না আসে, সেনাবাহিনী যেন আমাদের মাটি ছেড়ে চলে যায়।'

প্রথম রোজার ইফতার কী খাবেন তা জানতে চাইলে সে বলেছিল, তা নিয়ে তার কোনো পরিকল্পনা নেই। শত কষ্টের মধ্যেও মাইসুন শিবিরে প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করেন।

দুর্ভিক্ষের স্মৃতি ও বর্তমান আতঙ্ক

গত বছরের ১৯ মার্চ অর্থাৎ রমজানের দ্বিতীয় সপ্তাহে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সব সীমান্ত পথ। ফলে দেখা দিয়েছিল চরম মানবিক বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষ। এর আগের রমজান ছিল দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধের সংমিশ্রণ। গত অক্টোবরে গাজায় নতুন করে যুদ্ধ বিরতি শুরু হয়েছে। এখনো যুদ্ধবিরতি বজায় থাকলেও তা বেশ ভঙ্গুর। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) মতে, বাজারে কিছু খাবার পাওয়া গেলেও দাম আকাশচুম্বী। অধিকাংশ মানুষের হাতে অর্থ নৈই। তাঁরা ত্রাণের উপর নির্ভরশীল।

শূন্য থালার হাহাকার

গাজার দেইর আল-বালাহ শিবিরের ৫৫ বছর-বয়সী মা হানান আল আত্তার। উত্তর গাজার বাইত লাহিয়া থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে ১৫ জন সদস্য নিয়ে তিনি এখানে একটি তাঁবুতে

থাকছেন। প্রথম রমজানে একটি ত্রাণ সংস্থার ফুড পার্সেল পেয়ে তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। পার্সেলের ভেতর থাকা খেতুর, তেল, ডাল আর হালুয়া দেখে তিনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। তবে এ খুশির আড়ালে আছে বড় ক্ষত।

গ্যাসের সিলিন্ডার যখন 'গুপ্তধন'

গাজায় চলছে রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকট। দুই বছর ধরে লাকড়ির আগুনে রান্না করছেন হানান। অনেক কষ্টে জমানো কিছু টাকা দিয়ে রমজানের প্রথম দিন এক কেজি মাংস আর আলু কিনেছেন। লুকানো ৮ কেজির গ্যাস সিলিন্ডার বের করে তিনি জানান, এটি তাঁর কাছে 'গুপ্তধনের' মতো।

এবারের রমজান ছিল গাজাবাসীর কাছে কেবল উপবাসের মাস নয়, বরং টিকে থাকার এক কঠিন পরীক্ষা। হানান বা মাইসুন সবার একটাই প্রার্থনা ছিল 'এই রমজান যেন শান্তি নিয়ে আসে, যেন আবার সেই দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের কবলে পড়তে না হয়। আর আমরা যেন নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে পারি।'

গাজায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি

গাজা উপত্যকায় ৫ হাজার সেনা ধারণক্ষমতা সম্পন্ন বিশাল সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা করছে প্রশাসন। প্রায় ৩০০ একর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই প্রকল্পের ঠিকাদারি নথিপত্র পর্যালোচনা করে এ তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান। এই স্থান প্রস্তাবিত ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাবিলাইজেশন ফোর্সের (আইএসএফ) প্রধান কার্যক্রম কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আইএসএফ হলো বহুজাতিক সামরিক বাহিনী, যা গাজা শাসনের জন্য নবগঠিত 'শান্তি পর্ষদে'র অধীনে কাজ করবে।

কয়েক ধাপে এই ঘাঁটির নির্মাণকাজ শেষ করা হবে। এর ভেতর স্বল্প পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র, বাংকার এবং সরঞ্জামের বিশাল গুদাম থাকবে। ঘাঁটি ঘিরে রাখা হবে কাঁটাতারের বেষ্টনী দিয়ে। দক্ষিণ গাজার শুষ্ক ও সমতল অঞ্চলে এই দূর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যুদ্ধকবলিত অঞ্চলে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কিছু আন্তর্জাতিক, নির্মাণ সংস্থাকে এলাকাটি পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া সরকার এই বহুজাতিক বাহিনীর জন্য ৮ হাজার পর্যন্ত সেনা পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছে বলে জানা গেছে।

সবুজ সংকেত

গাজায় আইএসএফ মোতায়েনের অনুমোদন দিয়েছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। নবগঠিত শান্তি পর্ষদের অধীনে এই বাহিনী পরিচালিত হবে। জাতিসংঘের ভাষ্য অনুযায়ী, গাজার সীমান্তরক্ষা এবং আজন্তরীণ শান্তি বজায় রাখাই হবে এই বাহিনীর মূল কাজ। ফিলিস্তিনি পুলিশ বাহিনীকে প্রশিক্ষণের দায়িত্বও থাকবে।

বিশ্বের ২০টির বেশি দেশ এই শান্তি পর্ষদের সদস্য হিসেবে স্বাক্ষর করলেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি অংশ এখনো এর থেকে দূরত্ব বজায় রাখছে। যদিও জাতিসংঘের অনুমোদন নিয়ে এটি গঠিত হয়েছে।

অনুমতি কার

যে জমিতে এই বিশাল সামরিক কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তার মালিকানা কার- তা এখনো অস্পষ্ট। তবে দক্ষিণ গাজার এই অঞ্চলের একটি অংশ বর্তমানে ইসরায়েলি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, গাজায় অন্তত ১৯ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেটকম) এই ঘাঁটি সংক্রান্ত সব প্রশ্ন শান্তি পার্ষদের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

সহায়তা ঘোষণা

শান্তি পর্ষদের প্রথম বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, গাজা পুনর্গঠন তহবিলে ৭০০ কোটি ডলার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে ৯টি সদস্যরাষ্ট্র। সেই সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা রক্ষাবাহিনী (ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাবিলাইজেশন ফোর্স) মোতায়েনে রাজি হয়েছে পাঁচটি দেশ।

ওই বৈঠকে পর্ষদের উদ্দেশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, যুক্তরাষ্ট্র শান্তি পর্ষদকে ১০ বিলিয়ন (১ হাজার কোটি) ডলার সহয়তা দেবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরো জানান, গাজা পুনর্গঠনে প্রাথমিকভাবে একটি তহবিলের ব্যবস্থা করেছে কাজাখস্তান, আজারবাইজান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মরক্কো, উজবেকিস্তান, বাহরাইন, কাতার, সৌদি আরব ও কুয়েত। গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ অবসানে ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনার অংশ স্থিতিশীলতা রক্ষাকারী বাহিনী। এ বাহিনীতে সেনা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মরক্কো, ইন্দোনেশিয়া, কাজাখস্তান, কসোভো ও আলবেনিয়া।

গাজায় নিহতের সংখ্যা ৭৫ হাজার

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর গণহত্যামূলক যুদ্ধের সংখ্যা আগের সরকারি হিসাবের চেয়ে বেশি। চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেট-এ প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের শুরুর দিকেই গাজায় ৭৫ হাজারের বেশি 'সহিংস মৃত্যু'।

ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নিহত ব্যক্তির সংখ্যা নিয়ে যে অতিরিক্ত তথ্য দেয়নি, ধারাবাহিক এসব গবেষণা স্পষ্ট করেছে। তা ফিলিস্তিনিদের প্রাণহানির বিস্তৃতি দিয়ে শক্তপোক্ত ও নির্ভরযোগ্য ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথে প্রকাশিত 'গাজা মরটালিটি সার্ভে' নামের খানাভিত্তিক জরিপে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত গাজায় ৭৫ হাজার ২০০ জনের 'সহিংস মৃত্যুর' খবর নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ সংখ্যা যুদ্ধ শুরুর আগে গাজার মোট জনসংখ্যার ২২ লাখের প্রায় ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। একই সময় গাজায় ৪৯ হাজার ৯০ জন নিহত হওয়ার খবর দিয়েছিল হামাসের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। ল্যানসেটে প্রকাশিত হিসাব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যের চেয়ে ৩৪ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে হামলায়

নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৭১ হাজার ৬৬২-এ দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর নিহত হয়েছেন ৪৮৮ জন। ২০২৫ সালের ১০ অক্টোবর গাজায় যুদ্ধ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়। ইসরায়েল বরাবরই গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া হতাহতের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। যদিও গত জানুয়ারিতে ইসরায়েলি সেনা কর্মকর্তা সাংবাদিকদের জানান, যুদ্ধ চলাকালে গাজায় প্রায় ৭০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন।

'নিহতের সংখ্যাটি বেশি হলেও গবেষকদের মতে, হতাহতের জনমিতিক হার ফিলিস্তিনের সরকারি তথ্যের সঙ্গে বিস্ময়করভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে নারী, শিশু ও বয়স্কদের হার ৫৬ দশমিক ২ শতাংশ। ফিলিস্তিনের সরকারি হিসাবের সঙ্গে এ তথ্য অনেকটাই কাছাকাছি। গাজা মরটালিটি সার্ভেতে ২ হাজার খানার ৯ হার হাজার ৭২৯ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। সংখ্যা নির্ধারণে একটি কঠোর প্রমাণভিত্তিক গবেষণা কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে ।

গবেষকরা বলেন, গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য সংযত এবং নির্ভরযোগ্য। ফিলিস্তিনি হতাহতের তথ্যকে অস্বীকার করার জন্য ইসরায়েলের বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা এই গবেষণা খণ্ডন করেছে। বলা হয়, একাধিক স্বাধীন পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য যাচাই হওয়ায় চরম পরিস্থিতিতেও প্রশাসনিক হতাহত নথিবদ্ধকরণ ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে।'

গবেষণা প্রতিবেদনের প্রধান লেখক লন্ডনের হলোওয়ে ইউনির্ভাসিটির অর্থনীতির অধ্যাপক মাইকেল-স্পাগাট বলেন, গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া নিহতের সংখ্যাটি বিশ্বাসযোগ্য। সেখানে বিধ্বস্ত ভবনগুনোর নিচে এখনো কত মরদেহ চাপা পড়ে আছে, সেটা জানা না থাকায় সবচেয়ে কম ধরা হয়েছে।

এ গবেষণা প্রতিবেদন ২০২৫ সালের জানুয়ারি ল্যানসেট-এ একাশিত গবেষণার ফলাফলকে এগিয়ে নিয়েছে। এই গবেষণার পরিসংখ্যানভিত্তিক 'ক্যাপচার- রিক্যাপচার' মডেলিং পদ্ধতি ব্যবহার করে যুদ্ধের প্রথম ৯ মাসে ৬৪ হাজার ২৬০ জন নিহত হওয়ার কথা বলেছে।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছেই। গেল রমজানের প্রথম দিন গাজার দক্ষিণাঞ্চনীয় শহর খান ইউনিসে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে ফিলিস্তিনি যুবক নিহত হয়েছেন। গাজার স্বাস্থ্যসেবা ধ্বংস করেছে ইসরায়েল। গাজাবাসী বহন করছেন জটিল আঘাতের নজিরবিহীন বোঝা। গাজার ধ্বংসপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা তা সামাল দিতে সক্ষম নয়।

ইসরায়েলের সম্প্রসারণবাদী নীতির অংশ হিসেবে এর জনক ও পালক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন মন্ত্রী বলেছে, নীল নদ থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত আমাদের দরকার। এই হিসেবে তারা ইরানেও নেতানিহাহুর সাথে মিলে সর্বাত্মক হামলা চালিয়েছে।

ইসরায়েলের কোনো নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড নাই। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক সংজ্ঞার মধ্যে ইসরায়েল পড়ে না। রাষ্ট্রের সংজ্ঞার মধ্যে নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব থাকতে হয়। কিন্তু ইসরায়েলের প্রথম উপাদানই নাই। তবু ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করতে হয়। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রভু। ■

প্রশ্ন-১ ঃ ইমাম সাহেব যখন আওয়ায করে কিরাআত পড়েন তখন চুপ করে ইমামের কিরাআত শুনা মুক্তাদীদের উপর ওয়াজিব। তাই তখন মুক্তাদীদের কিরাআত পড়া বা সূরা ফাতিহা পড়া নিষেধ। কিন্তু ইমাম সাহেব যখন আস্তে আস্তে ও মনে মনে কিরাআত পড়েন তখন মুক্তাদীদের মনে মনে কিরাআত পড়তে কোনো বাধা আছে কিনা?

মুমিনুল হক, রামপুরা, ঢাকা

উত্তর ঃ সালাতে কিরাআত পড়ার ক্ষেত্রে একটি বিধান আছে তাহলো, ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর কিরআত। ইমাম মনে মনে বা চুপে চুপে কিরাআত পড়ুক কিংবা আওয়ায করে কিরাআত পড়ুক-উভয় অবস্থায় মুক্তাদীদের কিরাআত পড়ার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। বিধায় জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করলে ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের কিরাআত (সূরা ফাতিহা) পড়তে হয়না বা পড়া যায় না। বরং নিষেধ। অবশ্য এই মতটি হানাফী মাযহাবের মত। আর উপমহাদেশ যেহেতু হানাফী অধ্যুষিত অঞ্চল, তাই হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ এমতই আমল করে থাকেন। অবশ্য এমতটি ছাড়া এখানে অন্যান্য ইমামগণের আরো একটি মত আছে, সেটি হলো : ইমাম যখন আওয়ায করে কিরাঅত পড়েন তখন মুক্তাদীগণ নীরবে তাঁর কিরাআত পড়া শুনবেন। আর ইমাম সাহেব যখন আস্তে আস্তে বা মনে মনে কিরাআত পড়েন তখন মুক্তাদীগণও মনে মনে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। এ মত অনুযায়ী যোহর ও আসরের (ফরয) চার রাক'আতেই মুক্তাদীগণ ইমামের পিছনে নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। আর মাগরিবের শেষ বা তৃতীয় রাক'আতে এবং ইশার সালাতের শেষ দুই রাক'আতে মুক্তাদীগণ নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন।

প্রশ্ন-২ ঃ মাসবূক তার অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করার জন্য কখন দাঁড়াবেন? ইমামের ডান দিকে সালাম ফিরানোর সাথে সাথে অথবা পরে, নাকি ইমাম সাহেবের উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর?

আহসানুল হক, মতলব, চাঁদপুর

উত্তর ঃ ইমাম সাহেবের ডানে ও বামে উভয় দিকে সালাম ফেরানোর সাথে সাথে নয় বরং উভয়েদিকে সালাম ফেরানোর পর মাসবূক মুক্তাদী তার অবশিষ্ট ও বাদ পড়া সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়াবেন। ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে ,

وينبغي ان يصبر حتى يفهم انه لاسهو على الامام

ইমামের সালাম ফিরানোর পরে মুক্তাদীগণ সালাম ফিরাতে এতোটুকু সময় সবর করবেন, যাতে বুঝা যায় যে, ইমামের দায়িত্বে সাহু সাজদা নেই এবং তিনি সাহু সাজদা করবেন না। (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৬)

ফতোয়ায়ে স্বামীতে আছে, ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদিগণের সালাম ফেরাতে এতোটুকু সময় অপেক্ষা করা বাঞ্চনীয় যাতে জানা যায় যে, ইমাম সাহেব সাহু সাজদা করছেন না এবং ইমামের উপর সাহু সাজদা আবশ্যক হয়নি।

(রাদ্দুল মুহতার, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৫৯)

প্রশ্ন-৩ ঃ শেষ বৈঠকের পর ভুলে ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে গেছেন এবং লোকমা দেয়ার পরও তিনি বসেননি বরং দুই রাক'আত পূর্ণ করে সাহু সাজদা করেন। এমতাবস্থায় মুক্তাদীগণের করনীয় কি?

আলমগীর হোসেন, কাপাসিয়া, গাজীপুর

উত্তর ঃ ইমামের বসে যাওয়া জরুরী ছিল কিন্তু তিনি বসেননি। মুক্তাদীগণের কর্তব্য হবে তার অনুসরণ না করে বসা অবস্থায় তার ফিরে আসার ও বসার অপেক্ষা করা। ইমাম সাহেব সাজদা করার আগেই যদি ফিরে আসেন অর্থাৎ বসে যান তাহলে মুক্তাদীগণ তার সাথে সাহু সাজদা করে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবেন। ইমাম সাহেব যদি ফিরে না আসেন অর্থাৎ না বসেন তাহলে মুক্তাদীগণের করণীয় হবে সালাম ফিরিয়ে সালাত সমাপ্ত করা।

قال في شرح التنوير ان القوم ينتظرونه فان عاد تبعوه وان سجد: للخامسة سلموا لانه تم فرضه.

শারহি তানভীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, মুক্তাদীগণ ইমাম সাহেবের ফিরে আসার অর্থাৎ বসার অপেক্ষা করবেন। তিনি যদি ফিরে আসেন অর্থাৎ বসেন, তাহলে মুক্তাদীগণ তার অনুসরণ করবেন। আর ইমাম সাহেব যদি না বসে পঞ্চম রাক'আতের রুকূ' ও সাজদা করেন তাহলে মুক্তাদীগণ সালাম ফিরিয়ে সালাত সমাপ্ত করবেন। কেননা ফরয তো পূর্ণ হয়ে গেছে।

(আহসানুল ফাতাওয়া, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৭)

প্রশ্ন-৪ ঃ তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট সালাতের জামা'আতে ইমাম সাহেব প্রথম বৈঠকে। এমন অবস্থায় কিছু লোক জামা'আতে শরীক হয়ে তাশাহুদ পড়তে থাকেন। তাদের তাশাহুদ শেষ না হতেই ইমাম সাহেব তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যান। এমতাবস্থায় তাদের (উক্ত মুক্তাদিগণের) করণীয় কি?

মোঃ আরশাদ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

উত্তর ঃ এমন অবস্থায় তাদের করণীয় হবে, তারা তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পূর্ণ করে দাঁড়াবেন। তাশাহুদ পূর্ণ না করে দাঁড়ানো তাদের জন্য মাকরুহ তাহরিমি হবে। অনুরূপভাবে যারা শেষ বৈঠকে ইমামের সাথে জামা'আতে শরীক হন তারাও তাশাহুদ পূর্ণ করার আগে ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে ফেললে দাঁড়াবেন না বরং তাশাহুদ পূর্ণ করেই বাকি সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়াবেন।

(দেখুন আহসানুল ফাতাওয়া, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭৬)

প্রশ্ন-৫ ঃ স্বামী ঘুষ খায় স্ত্রীর সেটা খুবই অপছন্দ। কিন্তু ভয়ে স্বামীকে কিছু বলতেও পারছে না এবং স্বামীকে বাধাও দিতে পারছে না। এমতাবস্থায় স্বামীর উক্ত উপার্জনের জন্য স্ত্রী দায়ী ও পাপী হবে কিনা?

সালমা আক্তার, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

উত্তর ঃ স্বামী যদি হারাম পন্থায় উপার্জন করে তাহলে স্ত্রীর করণীয় ও কর্তব্য হবে, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বিজড়িত ভাষায় বুঝিয়ে স্বামীকে ঘুষ নামক বিষ খাওয়া থেকে বিরত রাখা, রক্ষা করা ও বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকা। এরপরও যদি সে ঘুষ খাওয়া থেকে বিরত না হয় তাহলে তাকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া যে, আমি না খেয়ে দিন কাটাবো তবুও আমার ঘরে হারাম অর্থ যেন না আনা হয়। হালাল উপার্জন যত কমই হোক তা-ই আমার জন্য যথেষ্ট হবে। স্ত্রী যদি স্বামীকে এইভাবে বুঝাতে থাকে তাহলে স্ত্রী গুনাহগার হবে না। হারাম ও ঘুষ খাওয়ার জন্য স্বামী-ই দায়ী থাকবে এবং গুনাগার ও জাহান্নামী হবে। আর স্ত্রী যদি এই পন্থা অবলম্বন না করে বরং স্বামীর আনা হারাম অর্থ নির্দ্বিধায় ব্যয় করতে থাকে, তাহলে এজন্য উভয়ে-ই একত্রে পাপী হবে ও জাহান্নামে যাবে।

প্রশ্ন-৬ ঃ জামা কিংবা প্যান্টের পকেটে মোবাইল রয়েছে। নামায চলাকালীন বারবার মোবাইল রিং হচ্ছে। এমতাবস্থায় দেখা যায় বহু নামায আদায়কারী ব্যক্তি পকেট থেকে মোবাইল হাতে নিয়ে কে রিং করল তা দেখে মোবাইল বন্ধ করে। এতে তাদের নামাযের ক্ষতি হবে কি? ক্ষতি হলে কেমন ক্ষতি হবে?

মাহমুদর রহমান, মগবাজার, ঢাকা

উত্তর ঃ সালাত আদায় করা অবস্থায় পকেটে থাকা মোবাইল বাজতে থাকলে অনেকে তা হাতে নিয়ে দেখেন, কে ফোন দিয়েছে বা কোথা থেকে ফোন এসেছে। এরপর মোবাইল বন্ধ করে পকেটে রেখে পুনরায় যথারীতি সালাত আদায়ে মনোযোগী হয়ে যান। এতে-

এক. ক্ষণিকের জন্য হলেও সালাত (নামায) থেকে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দুই. পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোবাইলটা হাতে নেয়া হয়।

তিন. মোবাইল চোখের সামনে আনা হয়।

চার. মোবাইলে নাম উঠলে নাম দেখা হয় বা নাম্বার দেখা হয়।

পাঁচ. এরপর জানা হয় পরিচিত কেউ বা অপরিচিত কেউ ফোনটা দিয়েছেন। এতে আর কিছু না হোক অন্তত এ কথা ও কাজগুলো অনিবার্যভাবে হয়ে থাকে। এবার আপনিই ফতোয়া দেন আপনার সালাত কোথায় আর আপনি কোথায়?

নিঃসন্দেহে এতগুলো সালাতবিমুখ কাজ সালাতের মধ্যে হয়ে গেলে সালাত কি করে ঠিক থাকে?

কেউ যদি কোন সালাত আদায়কারীর এই অবস্থা দেখে এবং ওই ব্যক্তির মনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাহলে নিঃসন্দেহে সে বলবে, এই লোক ও তার মন সালাতে নেই। আর ফিকহী পরিভাষায় এরূপ একাধিক কাজকে আমলে কাসীর বলা হয়। সালাতের মধ্যে

সালাতবিমুখ আমলে কাসীর করা হলে তাতে সালাত ফাঁসিদ ও বিনষ্ট হয়ে যায়। অতএব সালাতের মধ্যে সালাতবিমুখ আমলে কাসীর করার কারণে সালাতের মধ্যে এরূপ যারা করে এবং করবে তাদের সালাত ফাঁসিদ ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

সালাত আদায়কারী মুসল্লীগণের কর্তব্য হলো, সালাত শুরু করার পূর্বেই মোবাইল বন্ধ করা। কখনো মোবাইল বন্ধ করতে ভুলে গেলে এবং সালাতের মধ্যে মোবাইল বাজতে শুরু করলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে পকেটে রেখে এক হাতেই মোবাইলটা বন্ধ করে দেয়া। (দেখুন কিতাবুন নাওয়াযিল, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮৮, ১৮৯, ১৯০)

প্রশ্ন-৭ ঃ জল (পানি) ও স্থলের কি কি প্রাণী হালাল এবং কি কি প্রাণী হারাম?

আবদুল্লাহ আল আমিন, পাহাড়তলি, চট্টগ্রাম

উত্তর ঃ সমগ্র পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত। যথা- জল ও স্থল। জলভাগে বহু প্রাণী বাস করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাছ। অনুরূপভাবে স্থলেও বহু প্রাণী বাস করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মানুষ। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ ছাড়া জলে ও স্থলে যত প্রাণী ও যত সৃষ্টি আছে সবই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত বন্দেগী ও তার গোলামী বা দাসত্ব করার জন্য। মানুষ ছাড়া আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে জলে ও স্থলে যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তা থেকে ইমাম আবু হানিফার (র) এর মতে জলজ প্রাণীর মধ্যে সকল প্রকার মাছ খাওয়া মানুষের জন্য হালাল করেছেন এবং স্থল প্রাণীর মধ্যে যেসব প্রাণী দাঁত দিয়ে ছিড়ে ফেড়ে খায়, আর যেসব পাখি পায়ের পাঞ্জা ও নখর দ্বারা শিকার করে খায় সেগুলোকে হারাম করেছেন। এছাড়া স্থলভাগের বাদবাকি সকল প্রকার প্রাণী ও সকল প্রকার পাখির গোশত খাওয়া মানুষের জন্য হালাল করেছেন। (দেখুন আফকে মাসায়িল আওর উনকা হল, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা : ১৫৯-১৬০)

প্রশ্ন-৮ ঃ সুদ খাওয়া ও ঘুষ খাওয়ার মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করা হলে কিংবা হারাম পন্থায় উপার্জিত অর্থ সম্পদের যাকাত দিলে অথবা আল্লাহর রাস্তায় সাদাকা করা হলে অবশিষ্ট সম্পদ তার জন্য হালাল ও জায়েয হবে কি?

লতিফুর রহমান, চান্দিনা, কুমিল্লা

উত্তর ঃ যাকাত আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত একটি ফরয ইবাদাত এবং যে পাঁচটি ভিত্তির উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত যাকাত তার মধ্যে একটি। সুদ বা ঘুষ কিংবা যে কোনো হারাম উপায়ে উপার্জিত সম্পদের মালিকানা উপার্জন কারীর জন্য সাব্যস্ত হয় না।

(ফাতহুল বারী : ৩/২৭৯)

এরূপ অবৈধ সম্পদের আসল ও প্রকৃত মালিকের সন্ধান জানা থাকলে মালিককে বা তার উত্তরাধিকারীকে তা ফেরত দেওয়া জরুরী ও ওয়াজিব। আর তার মালিকের কোন সন্ধান জানা না থাকলে বা জানা না গেলে সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া তা সাদাকা বা দান করে দেওয়া ওয়াজিব। অতএব হারাম সম্পদের যাকাত দিলে তা হালাল ও পবিত্র হয় না এবং তা দ্বারা হাজ, উমরা বা অন্য যেকোনো নেকী ও সাওয়াবের কাজ করলে তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না। এ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ

রাব্বুল আ'লামীন কেবল হালাল জিনিসই গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করবে আল্লাহ তা'আলা তার ডান হাতে তা গ্রহণ করেন। অতঃপর তা দানকারীর জন্য প্রতিপালন করতে থাকেন। যেমন তোমাদের কেউ তার দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রতিপালন করে থাকে। এক পর্যায়ে সেই দান পাহাড় সমান হয়ে যায়। (দেখুন সহীহ আল বুখারী)

প্রশ্ন-৯ ঃ মুক্তাদি যদি ইমামকে সিজদা অবস্থায় পায়, তবে কি ইমামের সিজদা থেকে উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? না কি সিজদা অবস্থায়ই নামাযে শামিল হবে?

মামুনর রশিদ, মতলব, চাঁদপুর

উত্তর ঃ উত্তম হচ্ছে ইমামকে যে অবস্থায়ই পাবে সে অবস্থায়ই সালাতে শামিল হয়ে যাবে। কোনোরূপ অপেক্ষা করবেনা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

'তোমরা (ইমামের সাথে) যতটুকু পাও তা আদায় করো, আর যা ছুটে যায় তা পূর্ণ করো।' (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম) ■

ফতোয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

এখানে আল ফালাহ বিজ্ঞাপন যাবে

বই পরিচিতি

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

বইয়ের নাম : **তাযকিয়াতুন্ নাফস**
লেখক : **ড. আহমদ আলী**
পৃষ্ঠা : ২৮০, মূল্য : ৩০০ টাকা
প্রকাশক: ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী
প্রকাশনায়: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা

'তায্কিয়া' আররী শব্দটি। 'নাফ্স' শব্দটির আরবী অর্থ ব্যক্তি বা আত্মার পরিশুদ্ধি। নাফ্স বলতে মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বা আত্মাকেও বুঝায়। আবার একজন ব্যক্তিকেও বোঝায়। মোটকথা একজন ব্যক্তির আত্মার পরিশীলন বা অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষতার প্রভাব তার ব্যক্তিত্বে, চলনে, বলনে, মননে, প্রতিভাত হয়। ফলে একজন মানুষের পরিপূর্ণ মানসিকতা বা মানবিকতা প্রকাশ পায়।

আল কুরআনে তাকওয়ার কথা বলা হয়েছে। মূলত তাকওয়ার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে তায্কিয়াহ। অন্য কথায় আত্মার পরিশুদ্ধি ছাড়া তাকওয়া অর্জন করা সম্ভব নয়। আর তাকওয়া অর্জন করতে না পারলে কুরআন মাজিদের হিদায়াত বা পথনির্দেশ পাওয়া যাবে না। কারণ কুরআনুল কারিমের প্রথমেই বলা হয়েছে, কুরআন কেবল তাদেরকে পথনির্দেশনা দেবে যারা মুত্তাকী।

উপরিউক্ত আলোচনায় বুঝা যায় 'তায্কিয়াতুন নাফ্স' বইটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মুমিনের জীবনে বইটির গুরুত্ব অপরিসীম এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়। ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হবে এর বিষয়সূচী সম্পর্কে ধারণা পেলে। লেখক আলোচনা করেছেন তাযকিয়াতুন নাফ্সের বিশুদ্ধ পথ সম্পর্কে। যথার্থ ও সুন্দরতম উপায়ে ফারযসমূহ আদায় করা। যেমন সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি। নিয়মিত বুঝে বুঝে কুরআন অধ্যয়ন, সর্ব অবস্থায় ও সকল কাজে সুন্নাতের অনুসরণ, সুন্দর চরিত্র ও আচরণ, সবর, শোকর, বিনয় ও নম্রতা, সত্য কথা বলা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, আমানতের সংরক্ষণ করা, অল্পে তুষ্ট থাকা। লোভ-লালসা, আত্মপ্রীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহংকার, মিথ্যাচার, প্রদর্শনেচ্ছা, জাগতিক স্বার্থচিন্তা, গীবত, চোগলখুরি, রাগ, অপ্রয়োজনীয় বা অনর্থক কাজ পরিহার করা। বেশি বেশি নফল ইবাদাত করা, নফল সাদকা, নফল হাজ ও ওমরা করা, সার্বক্ষণ আল্লাহর যিকির অর্থাৎ আল্লাহর কথা স্মরণ করা, তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়া। বেশি বেশি তাওবা ও ইস্তেগফার করা, আখিরাত ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করা, সেজন্য প্রস্তুতি নেয়া। মানব সেবা করা, সাদাসিদে অনারম্বর জীবন যাপন করা, আত্মসমালোচনা করা ইত্যাদি। প্রতিটি বিষয়েই কুরআন সুন্নাহ্ ও বিজ্ঞ উলামাদের দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

বইটির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাইয়ের মান ভালো। বোর্ড বাঁধাই, জ্যাকেট কভার। ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করলে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকবে। আশা করি বইটি কিনে কোন পাঠকই হতাশ হবেন না। ■